অনীক

নভেম্বর ২০১৩

বর্ষ ৫০ □ সংখ্যা ৫

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক : দীপংকর চক্রবর্তী

সম্পাদকীয় □ ১

ঘটনাপ্রবাহ

লক্ষণপুর-বাথে হত্যাকাণ্ডে... □ শ্যামল দাস □ ২

বাংলাদেশ এখন— □ জয়ন্ত ভট্টাচার্য □ ৪

অব্যাহত দাঙ্গা: উত্তরপ্রদেশ □ তড়িৎ চৌধুরী □ ৬

আমেরিকার 'শাট-ডাউন' □ অপরাজিতা মুখার্জী □ ৮

মমতার রাজনীতি... □ পরিচয় কানুনগো □ ১০

নিরাপত্তারক্ষীদের নিরাপত্তা □ সঞ্জয় বসু □ ১৩

প্রতিবেশী দেশ

বিদ্যুতের বহু বিকল্প আছে... □ আনু মুহাম্মদ □ ১৪

প্রবন্ধ

গুজরাটে 'উন্নয়ন' ও মোদী উত্থান □ মুনমুন □ ১৭

আরব দুনিয়ায় ঘূর্ণিঝড় □ অরিজিৎ □ ২১

শহীদ দাভোলকার ও কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলন □ স্বপন শীল □ ২৬

ভিয়েতনাম-এর মুক্তিযুদ্ধ ও ভো নগুয়েন গিয়াপ □ সমরেশ মিত্র □ ৩০

রাজনৈতিক বন্দি : ভারত □ বিশ্বজিৎ রায় □ ৩৪

লেখা, চিঠিপত্র ও টাকা-পয়সা পাঠাবার ঠিকানা :

প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি

১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯

দূরভাষ : ৯৪৩৩৭২৪৪৬২/৮৯০২১০৪৯৮৭

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ১৫০ টাকা

ই-মেল : aneek.bm@gmail.com

ব্লগ : aneekpotrika.wordpress.com

কার্যালয় :

১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯

(মঙ্গল ও শুক্র : সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা)

সম্পাদকমণ্ডলী : **রতন খাসনবিশ**

সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস প্রণব

সম্পাদকীয়

নয়া-উদারবাদের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার মিশেল!

ছত্তিশগড়, দিল্লী সহ পাঁচটি রাজ্যের বিধান সভা নির্বাচন চলছে। ফল বের হবে ডিসেম্বর মাসে। আগামী বছর অর্থাৎ ২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে লোকসভা নির্বাচন। সুতরাং বর্তমান বিধানসভা নির্বাচন যেন আগামী লোকসভা নির্বাচনের সেমি ফাইনাল। প্রধান দুই পক্ষ কংগ্রেস ও বিজেপি।

ইউপিএ নেতৃত্বাধীন সরকারের দুবারের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ। ১৯৯০ সালে তাঁর অর্থমন্ত্রীত্বে ভারতে লাগু হয়েছিল নয়া উদারবাদ। পরবর্তী এনডিএ যুগে অবশ্য তার ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন ছিল। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি বেচে দেবার জন্য 'বিনিবেশ মন্ত্রক' বলে একটি দপ্তরই খোলা হয়েছিল এনডিএ আমলে।

ইউপিএ-১ ও ২ আমলে ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ, খনিজ সম্পদ, আকাশ-বাতাস সবই বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে, বা বিক্রি করার প্রক্রিয়া জারি আছে। দেশের মানুষের জীবন-জীবিকা বাজি রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, রাশিয়া সহ বিভিন্ন দেশের সাথে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের চুক্তি করা হয়েছে— যখন জাপান ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি ঘোষণা করছে যে তারা আগামী ১০ বছরের মধ্যে তাদের পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি একে একে বন্ধ করে দেবে।

মন্দার ধাক্কায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপে গত কয়েক বছরে ৯-১০ শতাংশে থাকা উন্নয়ন সূচক এখন ৪-৫ শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। শিল্পোৎপাদন ক্রমশ নীচের দিকে। ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মিথ আজ তলানিতে। গত দু'বছর গাড়ি বিক্রি ক্রমশ কমছে। অন্যদিকে মানবোন্নয়ন সূচকেও এদেশ এগিয়ে না গিয়ে পিছিয়েছে। পাঁচ বছরের নীচে শিশুদের অর্ধেক অপুষ্টির শিকার। ভারতে জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য গত বর্ষাকালীন অধিবেশনে পাশ হয়েছে খাদ্য নিরাপত্তা বিল। অর্থাৎ নয়া-উদারবাদ চালু হবার ২৩ বছর পর সরকারি হিসাবেই ৪০ শতাংশ লোক খেতে পায় না।

কেন্দ্রীয় সরকারে সম্ভবত একটাও দপ্তর খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে দুর্নীতির কোন অভিযোগ নেই। এ হেন অবস্থায় রাষ্ট্রের প্রতি আস্থা যখন একেবারে তলানিতে তখন শাসকশ্রেণীর প্রয়োজন অন্য মুখের। আর সেই মুখ হিসাবে বিজেপি শেষ পর্যন্ত হাজির করেছে নরেন্দ্র মোদীকে। যেন তাঁর হাতে আছে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ। আর সেই প্রদীপের জিনের কারসাজিতে উন্নয়ন সূচক উঠে যাবে আবার ৮-৯ শতাংশে, অপুষ্টি আক্রান্ত ৫০ শতাংশ শিশু গ্ল্যাক্সো বেবি হয়ে মা-বাবার কোল আলো করবে, শিল্পে তো বৃদ্ধি ঘটবেই।

দুর্নীতির বিচারে বিজেপি-র নিজের রেকর্ড এমন কিছু শুভ্র নয়। সদ্য প্রাক্তন সভাপতি নীতিন গড়করিকে দলীয় পদ ছাড়তে হয়েছে দুর্নীতির দায়ে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর জামাই রঞ্জন ভট্টাচার্যের নাম জড়িয়েছে কয়লা কেলেঙ্কারি সহ অন্যান্য কেলেঙ্কারিতে। ১০নং আকবর রোডের জামাইও গান্ধী পরিবারের যথেষ্ট বিড়ম্বনার কারণ। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে গত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে পর্যুদস্ত হবার পর জাতীয় রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক থাকার লক্ষ্যে সিপিআইএম উদ্যোগ নিচ্ছে তৃতীয় ফ্রন্ট গড়ার। তাদের আওয়াজ, সাম্প্রদায়িকতাকে পরাস্ত করুন। ইঙ্গিতটা পরিষ্কার। এ রাজ্যে ক্ষমতাসীন দল তৃণমূল কংগ্রেসের একমাত্র লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গে যত বেশি সম্ভব লোকসভা আসন দখল করা। কারণ তৃণমূল নেত্রী জানেন, জাতীয় রাজনীতিতে তাঁর গুরুত্ব এই অঙ্কটির উপরই নির্ভরশীল। কংগ্রেস-বিজেপি কেউই একক গরিষ্ঠতা পাবে না।

অথচ চিত্রটা অন্যরকমও হতে পারত। কুদামকুলাম থেকে জয়িতাপুর, নিয়ামাগিরি থেকে পস্কো বা ছত্তিশগড়ের প্রতিরোধ, কিংবা দিল্লী-হরিয়ানা-চেন্নাই-পুনের গাড়ি শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের শ্রমিক আন্দোলন জোরালো হচ্ছে। এদের একসূত্রে গেঁথে ফেলতে পারলে পার্লামেন্টারি দলগুলোর ঠুনকো ঔজ্জ্বল্যকে ম্লান করে দিয়ে জনগণের জন্য প্রকৃত বিকল্প গড়ে তোলা অসম্ভব নয়।

ঘটনাপ্রবাহ

লক্ষণপুর - বাথে বা বাথানিটোলা হত্যাকাণ্ডে 'ন্যায়বিচার'

মহাত্মা গান্ধীর 'জন্মমাসে' ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ বিচারব্যবস্থা, এক্ষেত্রে পাটনা উচ্চ আদালত, লক্ষণপুর-বাথের ৬১ জন দলিত-নিম্নবর্ণের মানুষের হত্যায় সেসন কোর্টে অভিযুক্ত ২৬ জন আসামীকে বেকসুর খালাস করে দিয়েছে ঘটনা ঘটার ১৬ বছর পর। বিহারের জেহানাবাদ জেলার এক অখ্যাত গ্রাম লক্ষণপুর-বাথে। দলিত-পিছড়েবর্গ-ছোট জাতের লোকদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্য ব্রাহ্মণ জমিদারদের বাহিনী রণবীর সেনার নেতৃত্বে এক নারকীয় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে। হত্যা করা হয় ১৬ জন শিশু, ২৭ জন মহিলা ও ১৮ জন পুরুষ— অর্থাৎ মোট ৬১ জন নাগরিককে। ভারত রাষ্ট্র যাদের চিহ্নিত করেছে সিডিউল কাস্ট হিসাবে।

বেকসুর খালাস করার কারণ হিসাবে উচ্চ আদালতের বক্তব্য— সেসন কোর্টে এই হত্যাকাণ্ডের মূল সাক্ষীর বয়ান বিশ্বাসযোগ্য নয়। অর্থাৎ ঘটনা ঘটার ১৬ বছর পর বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লক্ষণপুর-বাথের ৬১ জন নিহতের কোন হত্যাকারী নেই। বা থাকলেও যে ২৬ জন সেসন কোর্টে অভিযুক্ত হয়েছিল তারা নয়। পাটনা হাইকোর্ট এই রায় দেওয়ার এক বছর আগে বাথানিটোলা হত্যাকাণ্ডে একই ধরনের রায় দিয়েছিল। বাথানিটোলায় ২১ জন নিম্নবর্গের মানুষ নিহত হয়েছিলেন সেই ঘটনায়। রাষ্ট্র বা বিচার ব্যবস্থা সেই হত্যাকারীদের চিহ্নিত করতে পারে নি। সাজা দিতে পারে নি। বাথানিটোলা হত্যাকাণ্ড সম্পর্কিত পাটনা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে দাখিল করা আবেদন গত এক বছর যাবৎ অমীমাংসিত অবস্থায় পড়ে আছে। যা কিনা আদালতের দীর্ঘসূত্রতার একটি নমুনা হিসাবে ধরা যেতে পারে। 'বিলম্বিত বিচার, বিচার না পাওয়ার সমার্থক।' Justice delayed is justice denied.

ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের সাথে জাত-পাত ব্যবস্থার নিবিড় সম্পর্ক। সদ্য প্রয়াত ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মা ভারতের সামন্ততন্ত্রের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হিসাবে জাত-পাত ব্যবস্থাকেই চিহ্নিত করেছেন। ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা, ভূমি সংস্কার আইন কার্যত ব্যর্থ হয়েছিল বিহারে— অর্থাৎ গত শতাব্দীর শেষ দশকদুটিতে নিম্নবর্ণের দলিত-ছোট কৃষক-ক্ষেতমজুরদের সাথে উচ্চবর্ণের মালিক কৃষক এবং কুলাকদের একের পর এক হত্যা-বদলা-হত্যার ঘটনাগুলি এ ঘটনার বাস্তবতাকেই প্রমাণ করে।

১৯৮০-এর দশকে রাজপুত ভূস্বামী-কুলাকরা গড়ে তুলেছিল সানলাইট সেনা। কুর্মীদের ছিল ভূমি সেনা, যাদবদের ছিল কিষাণ সংঘ, ভূমিহারদের ছিল ভূমি সেনা। গঙ্গা-শোন বিধৌত উর্বর ভোজপুর, জেহানাবাদ, রোহতাস, গয়া, পাটনা জেলাগুলি জুড়ে এই বাহিনীগুলি গড়ে উঠেছিল প্রধানত নিম্নবর্ণের চামার, মুসাহার, দুসাদদের মধ্যে উদীয়মান সমান অধিকার বোধ, মানুষ হিসাবে সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা দমন করার জন্য। আর নিম্নবর্ণের এই মানুষগুলির মনে সাহস জুগিয়েছিল বিভিন্ন সিপিআই(এম-এল) গোষ্ঠীগুলি ও তৎকালীন এমসিসি সংগঠন। এক্ষেত্রে মজদুর-কিষান সংঘর্ষ সমিতির এক জমায়েতে বিহার পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যা করে ১০-১২ জন মানুষকে। এ ঘটনা রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে উচ্চবর্ণের ভূস্বামীদের সাথে প্রত্যক্ষ সহযোগিতার প্রমাণ। আরওয়ালে সংঘটিত এই হত্যাকাণ্ডকে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন তুলনা করেছিলেন '৪৭ পূর্ববর্তী জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের সাথে। সশস্ত্র এই প্রাইভেট সেনাগুলির বিরুদ্ধে প্রতিরোধও হয়েছিল সশস্ত্র। ফলে ১৯৮০-র শেষদিকে রাজপুত-ভূমিহার ইত্যাদি ভূস্বামীদের এই সেনাগুলি আত্মসমর্পণ করে বা পাল্টা প্রতিরোধে পরাজিত হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, নিম্নবর্ণের এই মানুষগুলি নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারতেন না ভারতীয় গণতন্ত্রের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে। জোতদার-কুলাকদের দলগুলির বিরোধিতা করার সাহস দেখানোর নামমাত্র সম্ভাবনা দেখা দিলেই অনেক জায়গায় নিম্নবর্ণের মহল্লাগুলি ঘিরে রাখতো ভূস্বামীদের বাহুবলীরা। সিপিআই(এম-এল) গোষ্ঠীগুলি ভোটদানের অধিকারকে সামনে নিয়ে নিম্নবর্ণের প্রান্তিক মানুষকে সংগঠিত করেছিলেন, যদিও তাদের অনেকেই ভোট বয়কটকে বিপ্লবী রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে করতেন বা এখনও মনে করেন। গত শতাব্দীর শেষ ভাগেও বিহারের অবস্থা ছিল অনেকটাই 'খাজনা আদায়ের কাছারি'তে বর্ণিত ভূস্বামী প্রজা কৃষক সম্পর্কের মতই।

১৯৮০-র দশকের শেষে অনেকটাই যখন ভূস্বামী-কুলাকরা কোণঠাসা অবস্থায় তখন বিহারের এই অঞ্চলের ভূস্বামী-কুলাকদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য জন্ম নেয় রণবীর সেনা। ভোজপুরের খোপিরায় ৪ এপ্রিল ১৯৮৫ সালে। রণবীর সেনার প্রধান ব্রহ্মেশ্বর সিং-এর একটি সাক্ষাৎকার নেন *ডান মরিসন* ২০১২ সালের তাঁর নিহত হওয়ার আগে। "শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার জন্য হিংসা পাপ নয়"। উচ্চবর্ণের ভূস্বামী-জোতদার-কুলাকদের কাছে তিনি ছিলেন 'গান্ধী'। আর এই ছিল তাঁর দর্শন। লক্ষণপুর-বাথে হত্যাকাণ্ডে ৬১ জন নিহতের মধ্যে ছিলেন ১৬ জন শিশু ও ২৭ জন মহিলা। এ প্রসঙ্গে রণবীর সেনার বক্তব্য— "আমরা শিশুদের হত্যা করি কারণ বড় হয়ে এরা নকশাল হবে। আমরা নারীদের হত্যা করি কারণ এরা নকশালদের জন্ম দেয়।" "শিশুদের" ও "নারীদের" বলতে

বোঝানো হচ্ছে নিম্নবর্ণের শিশু ও নারীদের। ২০০০ সালে মিঁয়াপুরে (জেলা-আউরঙ্গাবাদ) ৩৫ জন দলিত মজুরকে হত্যার ঘটনাই রণবীর সেনার শেষ গুরুত্বপূর্ণ বড় মাপের হত্যার ঘটনা। ভোজপুরের খোপিরাতেই ব্রহ্মেশ্বর সিং সকালে নিজের বাড়ির কাছেই আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

ডান মরিসনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রণবীর সেনা প্রধান ব্রহ্মেশ্বর সিং জানান ১৯৮০-র শেষ ভাগে তাঁরা জমি চাষ করতে পারছিলেন না। কারণ নিম্নবর্ণের মানুষগুলো তাদের জমি চাষ করতে অস্বীকার করছিল। এমনকি খেতমজুররা তাদের জমিতে খাটতে অস্বীকার করে অনেক জায়গায়। জমি চাষ করতে না পারার কারণে উচ্চবর্ণের পরিবারের যুবকরা শহরে চলে যাচ্ছিল। এমনকি অবস্থা এমন হয় যে অনেক উচ্চ বর্ণের পরিবার মেয়েদের বিয়ে দিতে পারছিল না। সুতরাং তাদের আর কীই বা করার ছিল— 'রণবীর সেনা' তৈরি করে এই মুসাহার, চামার নিম্নবর্ণের 'বেতমিজ'গুলোকে 'সবখ্' শেখানো ছাড়া।

নিম্নবর্ণের এই মানুষগুলো তাদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আন্দোলনে যত বেশি অগ্রসর হয় ততই দুর্বল হতে থাকে উচ্চবর্ণ অধ্যুষিত বা তাদের স্বার্থরক্ষাকারী হিসাবে কংগ্রেস দল। ফলত জগন্নাথ মিশ্রের পর আর কোন কংগ্রেসি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন নি। এই পরিস্থিতিতে কাজে লাগিয়ে নিম্নবর্ণের মেসাইয়া হিসাবে সামনে আসে লালুপ্রসাদ যাদব বা রামবিলাস পাসোয়ানরা। সাময়িকভাবে পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য লালুপ্রসাদ বা রামবিলাস পাসোয়ানদের সাথে সমঝোতা করে উচ্চবর্ণের ভূস্বামীরা তাদের অবস্থান থেকে কিছুটা পিছিয়ে এসে। কারণ বিহারের আমলাতন্ত্র-পুলিশ বাহিনীতে উচ্চ পদে আসীন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উচ্চবর্ণেরই প্রাধান্য। অন্য রাজ্যগুলিও এক্ষেত্রে খুব এগিয়ে আছে এটা বলা যাবে না। এই পরিস্থিতিতে বিচারবিভাগের পরিস্থিতিও একই রকম হবে— এটা বলাই বাহুল্য। মুখ্যমন্ত্রীত্বে লালুপ্রসাদের মত 'পিছড়ে বর্গের' মেসাইয়া থাকা সত্ত্বেও রণবীর সেনা ১৯৯৫ থেকে পরবর্তী বছরগুলিতে ২৭০ জনের বেশি নিম্নবর্ণের মানুষকে হত্যা করেছে। আর রণবীর সেনার নেতা ২০১২-তে আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়। নিম্নবর্ণের মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সামনের সারিতে ছিলেন যে বামপন্থী বিপ্লবী সংগঠনগুলি, বিহারে বাস্তব রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে না পারার কারণে তাঁরা কার্যকর কোন বিকল্প গড়ে তুলতে পারলেন না। গ্রামের ভূস্বামী-জোতদার-কুলাকদের হাতে নিপীড়িত নিম্নবর্ণের মানুষ ও শহুরে ঠিকা শ্রমিক-মধ্যবিত্তদের ঐক্যবদ্ধ করতে না পারার কারণে উত্থান হলো লালুপ্রসাদের মত সুযোগ সন্ধানীদের।

ভারতীয় গণতন্ত্র প্রান্তিক মানুষদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ একথা সর্বজনস্বীকৃত। বিচার ব্যবস্থার কাছে প্রান্তিক মানুষ, লাঞ্ছিত মানুষ, উৎখাত হওয়া মানুষ ছুটে গেছেন বারবার অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার-লাঘবের আশায়। অনেক ক্ষেত্রে তারা সাময়িক আশার আলো দেখেছেন। বা কখনো পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছেন। পাটনা উচ্চ ন্যায়ালয়ের সাম্প্রতিক রায়ে লক্ষ্মণপুর-বাথের মানে আপাতত দাঁড়ালো— ১৯৯৬ সালের ৩০ নভেম্বর রাতে নিহত ৬১ জন নাগরিককে কেউ হত্যা করে নি। এক বছর আগে ২০১২ সালের পাটনা উচ্চ ন্যায়ালয়ের আর একটি রায়ে যেমন বাথানিটোলার ২১ জন নিহতের কোন হত্যাকারী নেই। যদিও বাথানিটোলার মামলা গত এক বছর যাবৎ 'বিচারাধীন' আছে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের সামনে।

ভবিষ্যত বলবে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় বাথানিটোলা বা লক্ষ্মণপুর-বাথে হত্যাকাণ্ড দুটির হত্যাকারীদের কোন সন্ধান দিতে পারবে কিনা। বা সন্ধান পাওয়া গেলেও দণ্ডবিধি অনুযায়ী কোন সাজা দেওয়া যায় কিনা। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন মধ্যপ্রদেশ বর্তমান ছত্তিশগড়ের শ্রমিক নেতা শঙ্কর গুহ নিয়োগীর হত্যাকাণ্ডে যুক্ত দোষীদের সাজা দিতে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের রায় স্মরণ করা যেতে পারে। ১৯৯১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ভিলাইতে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন শঙ্কর গুহ নিয়োগী। দুর্গ নিম্ন আদালতের রায়ে পাঁচ জন শিল্পপতির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় ১লা জুন ১৯৯৭ সালে। শিল্পপতিদের দ্বারা নিযুক্ত ভাড়াটে খুনীর সাজা হয় ফাঁসি। ১৯৯৮ সালের জুন মাসে মধ্যপ্রদেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ের জব্বলপুর বেঞ্চ নিম্ন আদালতের রায় খারিজ করে দিয়ে সব সাজাপ্রাপ্তকে মুক্তি দেয়। উচ্চ ন্যায়ালয়ের এই রায়ের বিরুদ্ধে আদালতে আবেদন করে সিবিআই ও ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চা। ২০০৫ সালে সর্বোচ্চ আদালত মধ্যপ্রদেশ উচ্চ আদালতের রায়কে পরিবর্তিত করে এবং ভাড়াটে খুনিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দেয় এবং শিল্পপতিদের ব্যাপারে মধ্যপ্রদেশ উচ্চ আদালতের রায়কে বহাল রাখে। অর্থাৎ শিল্পপতিরা কোন সাজা পান না। শঙ্কর গুহ নিয়োগী কোনো ধরনের 'দেশদ্রোহ'মূলক কাজে যুক্ত ছিলেন একথা কেউ বলতে পারবেন না। তিনি শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন আইনসম্মতভাবেই। অর্থাৎ সর্বোচ্চ আদালতে ক্ষমতাবানদের, বিত্তশালীদের, সমাজের মাথায় যাঁরা বসে থাকেন তাদের বিরুদ্ধে কোনো গুরুতর পদক্ষেপ নিয়েছেন এ রকম নজির হাতে গোনা। এ অবস্থায় লক্ষ্মণপুর - বাথে বা বাথানিটোলার কোন নিহত মা বা বাবার সন্তান নিজের হিসেব চুকানোর জন্য অন্য পন্থা গ্রহণ করেন, তা হ'লে কি খুব অন্যায় করবেন?

শ্যামল দাস

বাংলাদেশ এখন— যেমন দেখে এলাম

২৫ অক্টোবর সন্ধ্যেবেলা চট্টগ্রামের সমুদ্রের ধারে সদ্য স্পিডবোটে ঘুরে এসে এটা-সেটা দেখছি। সাথে ওখানকার অকৃত্রিম বন্ধু এরশাদ। সেসময় ফোন এলো— তোমরা ফিরে এসো এখুনি, ২৭ তারিখ থেকে ৬০ ঘণ্টা হরতাল। আমরা সে রাতে ১২-টার সময় বাস ধরে ঢাকায় এসে আমার বৃহৎ-হৃদয় অসামান্য বন্ধু তারেকের (ওমর তারেক চৌধুরী) তত্ত্বাবধানে রওনা দিলাম দিনাজপুরের পথে। বাংলাদেশের হরতাল কী বস্তু সে বিষয়ে চাক্ষুষ না দেখলে অনুমান-ই করতে পারতাম না। আমাদের এখানকার সাথে কোনো মিল নেই কেবল সমস্ত প্রতিষ্ঠান এবং সবকিছু বন্ধ থাকা ছাড়া। একটি হরতাল কেমন হিংসাশ্রয়ী চেহারা নিতে পারে তারও কোনো আগাম ধারণা ছিলনা।

সমাজ, রাজনীতি ও সমাজ জীবনের একজন সাধারণ পর্যবেক্ষক হিসেবে কতকগুলো প্রশ্নের মুখে ঠেলে দেয় এই অভিজ্ঞতা। ২২ অক্টোবর এবং তার আগে থেকেই বাংলাদেশের সংবাদপত্রে হরতালের পূর্বভাস পাওয়া যাচ্ছিলো। ''দৈনিক জনকণ্ঠ'' পত্রিকায় ২২শে অক্টোবরের শিরোনাম ছিল— ''নির্বাচনকালীন সরকার''। সমস্যার শুরু হয়েছে বাংলাদেশের নির্বাচনকে ঘিরে। সংবিধান অনুযায়ী ২৫ অক্টোবর শেষ হয়েছে শেখ হাসিনা সরকারের মেয়াদ। আগামী ২৫ জানুয়ারির মধ্যে জাতীয় নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। এই তিন মাস সরকার পরিচালনার ধরন কী হবে, এই নিয়ে মূলত আপাত সংঘাত। কিন্তু আমার বিচারে সমস্যা ছড়িয়ে আছে আরও বিভিন্ন জায়গায়। এগুলো পরপর দেখলে এভাবে দেখা যায়— প্রথম, বাংলাদেশের রাষ্ট্রের রাজনৈতিক চরিত্র কী হবে; দ্বিতীয়, অর্থনৈতিক অভিমুখ কোন দিকে; তৃতীয়, আন্তর্জাতিক স্তরে বাংলাদেশের সম্পর্কের ধরন কেমন হবে।

এ বিষয়গুলো আলোচনার আগে স্মরণ করে নেওয়া যেতে পারে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের সময় থেকে এবং পরবর্তী চার দশক জুড়ে আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে কতটা এবং কীভাবে গড়ে উঠেছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভাষাকে কেন্দ্র করে যে জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থান ঘটে তা নেশন-স্টেট বা জাতি রাষ্ট্র পেয়েছিলো কিনা। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, ফজলুল হক বা মৌলানা ভাসানি কিংবা মুজিবর রহমান যে ভাবেই বাঙালির বা অবিভক্ত ভারতের (১৯৪৭ পূর্ববর্তী সময়ে) জাতীয়তাবাদের স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্মণ চিহ্নিত করুন না কেন, আন্তর্জাতিক পুঁজির বর্তমান পরিস্থিতিতে জাতি-রাষ্ট্রের উপস্থিতি একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতি-রাষ্ট্রের বিকাশের সাথে যথেষ্ট পরিমাণ সংপৃক্ত হয়ে আছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের এবং এই প্রক্রিয়া বৃদ্ধির প্রশ্ন। আবার জাতি-রাষ্ট্রের উদ্ভব ছাড়া পুঁজির অখণ্ড বাজার তৈরি হওয়া মুশকিল। পুঁজির অখণ্ড বাজার ছাড়া আন্তর্জাতিক পুঁজি লগ্নি করার ঝুঁকি নেবেনা। যেটুকু লগ্নি হবে তা মূলত গরিব দেশের ভুখা মানুষের শ্রমকে ব্যবহার করে আউটসোর্সিং। এই মুহূর্তের দ্বিতীয় বৃহত্তম (চীনের পরেই) পোষাক উৎপাদক দেশ বাংলাদেশ। এ পোষাক যায় আমেরিকা এবং ইউরোপে। *অ্যাডিডাস, নাইক, মন্টে কার্লো* ইত্যাদি ছাপ নিয়ে বিশ্বের বাজার ছেয়ে ফেলে। বাংলাদেশের মোট রপ্তানির শতকরা আশি ভাগ আয় হয় বস্ত্র রপ্তানি থেকে। আবার এ শিল্পে অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত শ্রমিকের মজুরির হার এত নিচে যে এ নিয়ে শ্রমিক অসন্তোষ লেগেই আছে। এখানে বেশিরভাগ শ্রমিক নারী। এ ধরনের উৎপাদন কোনো নিবিড়-পুঁজি নির্ভর নয়। আবার, এরকম ফাটকা পুঁজি আজ আছে তো কাল নেই। সাম্রাজ্যবাদের কৃপায় পৃথিবীতে নিরন্ন মানুষের সংখ্যা সারা বিশ্বেই শনৈ শনৈ বাড়ছে। ফলে বাংলাদেশে না পোষালে পুঁজি অন্য দেশে চলে যাবে। প্রশ্ন একটাই, বাংলাদেশ বা চীনের মতো এত কম পয়সায় এত দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যাবে কি না। পুঁজি এবং শ্রমের দ্বন্দ্বে এই মুহূর্তে এগিয়ে আছে পুঁজি। এটা দুর্ভাগ্যজনক হলেও ঐতিহাসিক বাস্তব। মার্কস-এর ভাষায়, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়— প্রথমবার বিয়োগান্ত রূপে, দ্বিতীয়বার প্রহসন হিসাবে। বাংলাদেশে আমরা ট্রাজেডি দেখছি। পরবর্তী অধ্যায়ও হয়তো প্রত্যক্ষ করবো আমরা। কবে তা জানিনা।

এইরকম এক প্রেক্ষিতে ১১ নভেম্বর *গার্ডিয়ান* সংবাদপত্রে একটি খবরের শিরোনাম ছিল, "MPs suggest 'kitemark' scheme in wake of Bangladesh factory collapse." খবরটিতে বলা হয়েছে, ''রাণা প্লাজার ঘটনার প্রেক্ষিতে এমপি-রা চাইছেন এমন একটা প্রকল্প যা বাইরের দেশের কারখানাগুলোর অবস্থার উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করবে।'' আপাতদৃষ্টিতে অতীব মানবিক প্রস্তাব। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের মন্দা-দীর্ণ ইউরোপ ও আমেরিকাতে বাংলাদেশের সস্তার পোষাক সরবরাহ করতে না পারলে তো আবার সেখানকার মানুষ খেপে যাবে। তবে এর ফলে হয়ত বাংলাদেশের পোষাক-ফ্যাক্টরিগুলোর কিছু রিফর্ম হবে। শিল্পহীন বাংলাদেশে, পোষাক-শিল্প ছাড়া, সুন্দরবন এলাকায় ভারতবর্ষের *পস্কো*-র মতো স্থানীয় মানুষ এবং জীব-বৈচিত্র্য বিপন্ন করে রামপাল-এ বিদেশি পুঁজি-নির্ভর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করার চেষ্টা চলছে। ওখানকার বুদ্ধিজীবী সমাজের একাংশ একে প্রতিহত করার জন্য জনমত গঠন এবং আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টাও করছেন।

১৯৭১-এ ভাষাকে ভিত্তি করে দেশের গোড়াপত্তন হবার পরে ভাষার স্ব-ভূমি বা স্বাতন্ত্র্য সংক্রান্ত চেতনা যে শক্তি ও গতি নিয়ে গড়ে উঠেছে, মার্ক্সীয় পরিভাষায় অবাধ শ্রম

(untramelled labour) অথবা আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী ধারণায় পুঁজি (সে পুঁজির চরিত্র শিল্পীয় বা ফাটকা, যাই হোক না কেন) সেভাবে গড়ে ওঠেনি। এর ভালোমন্দ দুটো দিকই আছে। একদিকে এর ফলে যেমন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক চরিত্র সংকীর্ণ (parochial) থেকেছে, আবার অন্যদিকে ভারতবর্ষে (বিশেষ করে মেট্রোপলিটান ভারতবর্ষে) যেমন তীব্র তীক্ষ্ণ বিচ্ছিন্নতাবোধ জন্ম নিয়েছে, সে ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধ বাংলাদেশে বহুলাংশে অনুপস্থিত। বরঞ্চ যে সামাজিক বন্ধন মানুষকে ব্যবহারিক এবং মনোজগতে আশ্রয় দিতে পারে সে সামাজিক বন্ধন বর্তমান বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং অন্যতম চারিত্র্য লক্ষ্মণ।

বর্তমান বাংলাদেশের বিশেষ অবস্থায় জন্ম নেওয়া নানা ধরনের রাজনৈতিক টানাপোড়েনের ফলে কয়েকটি বাস্তবতা আমাদের সামনে আসে। কোনো গণতান্ত্রিক দেশে সমাজের নিজস্ব গতিতে রাজনৈতিকভাবে সমাজের তাৎক্ষণিক (synchronic) ও পর্যায়ক্রমিক (diachronic) বিভাজন হয়। গণতান্ত্রিক কাঠামো দুর্বল থাকার জন্য এরকম বিভাজন বাংলাদেশে অনুপস্থিত। সিভিল সোসাইটির অস্তিত্ব খুব স্পষ্ট নয়। পলিটিকাল সোসাইটির যে ধারণার কথা বলা হয় তাও খুব প্রাণবন্তভাবে উপস্থিত নয় বাংলাদেশে।

আরেকটি ব্যাপার আমাদের বিচারে রাখতে হবে। পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে, সে সমস্ত দেশে এ ব্যবস্থারই অনুক্রম হিসেবে বিভিন্ন স্তরে স্তরায়িত এবং থাকবন্দী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। সহজভাবে বললে, অজস্র প্রবাহী পথে রাষ্ট্র পৌঁছয় জনজীবনের প্রতিটি স্তরে— এটা রাষ্ট্রের কল্যাণকামী মুখকে যেমন দৃশ্যগোচর করে, তেমনি রাষ্ট্রের নজরদারিও সম্ভব করে তোলে জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রের ওপরে। বাংলাদেশের বিশেষ ঐতিহাসিক বাস্তবতায় অসামরিক প্রশাসন এ জায়গাগুলো ভরাট করতে পারেনি। প্রশাসনিক এ দুর্বলতা খানিকটা প্রতিস্থাপিত হয়েছে অসংখ্য বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও দিয়ে। এমনকি জনমুখী কাজের মধ্যেও সাধারণ মানুষ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন ঘটেনি। ফলে, একটু মোটা দাগে বললে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখনো একক ব্যক্তিত্ব নয়, সামূহিক মানুষ (collective social being) বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সামূহিক মানুষ বা কৌম মানুষের মতামত প্রধানত নির্ধারিত হয় বিশেষ বিশেষ অবস্থানে স্থিত জনজীবনের গতিপ্রবাহ কোন দিকে, তার ওপরে। এখানে বহুক্ষেত্রেই ধর্মীয় চেতনা ও চৈতন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। এজন্য আমাদের বন্ধুরা সহ বাংলাদেশের অগণন মানুষ যারা রাষ্ট্রনীতিতে সর্বধর্মে সমদৃষ্টি (আমি সেকুলারিজম শব্দটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাইছি না, বোঝাতে চাইছি ধর্মীয় নিরপেক্ষতা) চান, তাদের মতামত জনজীবনের ওপরে নির্ণায়ক প্রভাব তৈরি করতে এখনো অবধি সফল হয়েছে বলা যাবেনা।

২৬ অক্টোবর থেকে ওদেশের বিভিন্ন মিডিয়া ও নিউজ চ্যানেলে দেখানো শুরু হয়েছিল শেখ হাসিনা ও বেগম জিয়ার মধ্যেকার "ফোনালাপ"। দুজনের মধ্যে কথা চলেছিলো ৩৭ মিনিট। উদ্দেশ্য ২৭ থেকে ২৯ তারিখের হরতালের নিরসন ঘটানো ও নির্বাচন নিয়ে সমঝোতায় পৌছনো। যথারীতি এ "ফোনালাপ" ফলপ্রসূ হয়নি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যে নিজেদের মতো করে একে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে, রাজনৈতিক ফায়দা ওঠাতে চাইছে, এ তো নিতান্ত স্বাভাবিক ঘটনা এবং ওদেশের একেবারে অভ্যন্তরীণ বিষয়। এ বিষয়ে কোনো মতামত দেবার অধিকারী আমি নই। কিন্তু যে বিষয়টি নজরে এসেছে, তা হলো, দুজন প্রধানমন্ত্রী (প্রাক্তন ও বর্তমান) লঘুচ্ছলে জাতীয় স্বার্থের কথাগুলো বলছেন। একজন রাজনৈতিক নেতা এবং স্টেটসম্যান বা রাষ্ট্রনায়কের মধ্যে বিভাজন রেখা এখানে অপসৃত হয়ে যায়। আগে যে সামূহিক মানুষ, অসামরিক প্রশাসনের দুর্বলতা বা সংকীর্ণতা নিয়ে আলোচনা করেছি, সে সমস্ত কিছু বা আরো অন্যান্য উপাদানে রাষ্ট্রনীতির এ বিশেষ চেহারা নির্মিত হয়েছে, যেখানে রাজনৈতিক নেতাকেই স্টেটসম্যান হিসেবে দেখতে হয়। উল্টোদিক থেকে রাজনীতিকে অতিক্রম করে স্টেটসম্যান-এর জন্ম অধরা থাকে। একারণে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার জন্য আমেরিকা সহ বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের দূতাবাসের চাপ থাকলেও সে চাপকে উপেক্ষা করে স্থানীয় রাজনীতি তার নিজস্ব গতিপথে এখনো অবধি চলছে। আন্তর্জাতিক পুঁজির লগ্নি যেহেতু এখনো বিপুল পরিমাণে বাংলাদেশে ঘটেনি, এজন্য হয়তো বা আন্তর্জাতিক স্তরেও অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশে চাপ কম থাকছে।

অনুমান করা মুশকিল, আরও কতদিন বাংলাদেশের আধ-পেটা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা হরতাল আর ক্লান্তিকর রাজনৈতিক তর্জার চাপ সহ্য করবেন। গত তিন সপ্তাহে প্রায় এক সপ্তাহের বেশি হরতাল হয়েছে, একের পর এক বাস পুড়েছে, ট্রেন অটো সহ অন্যান্য যানবাহন জ্বলেছে। ৭০ জনেরও বেশি মানুষ আহত বা নিহত হয়েছেন। শুধু পর্যটন শিল্পে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২০০০ কোটি টাকার মতো।

এখান থেকে বলা দুষ্কর কীভাবে ধর্মতে বাঁধা না পড়ে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক আন্দোলন বাংলাদেশে গড়ে উঠবে। কিন্তু নান্য পন্থা বিদ্যতে। ভাষার দাবিতে গণজোয়ারের উজ্জ্বল ঐতিহ্য বাংলাদেশের আছে। উজ্জ্বল ঐতিহ্য আছে মুক্তকণ্ঠ বুদ্ধিজীবী সমাজের অস্তিত্বের এবং তার স্বশক্তিতে আত্মপ্রকাশের। আজকের বাংলাদেশে আমার বিচারে, গণজোয়ারেরর চাইতে বেশি প্রয়োজন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জোয়ারের। সময় বলবে কোন পথে হাঁটবেন আমাদের বন্ধুরা।

Tell me how many roads must a man walk down
Before you can call him a man.

জয়ন্ত ভট্টাচার্য

ঘটনাপ্রবাহ

অব্যাহত দাঙ্গা: উত্তরপ্রদেশ ২০১৩

এবার উত্তরপ্রদেশ। জেলা মুজাফ্‌ফরনগর, যেখানে সাধারণ মানুষের জীবনজীবিকা মূলত আখ চাষের সঙ্গে যুক্ত, সেইখানে গুজরাটের দাঙ্গার পরবর্তী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা হিসাবে বর্তমানের বৃহত্তম দাঙ্গাটি শুরু হলো। ২০০২ সালে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ লড়াই হয়েছিল গুজরাটে, কিন্তু দাঙ্গার রাজনীতি যে চাপা পড়েনি তারই প্রমাণ সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের মুজফ্‌ফরনগরে তৈরি হওয়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাটি।

দাঙ্গার বিবরণে ঘটনার শুরু ২৭ আগস্ট মুজফ্‌ফরনগর জেলার একটি গ্রামে একটি জাঠ হিন্দু মেয়ের শ্লীলতাহানি নিয়ে। একটি মুসলমান ছেলে ঐ ঘটনায় যুক্ত। তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে মেয়েটির দুই ভাই সানি সিং ও গৌরব সিং সশস্ত্র হয়ে দোষী ছেলেটির (নাম শাহনওয়াজ কুরেসী) বাড়িতে আক্রমণ করে তাকে পিটিয়ে মারে। এর পরিবর্তে একই দিনে খুনের সাথে যুক্ত দুই ভাইকে পিটিয়ে মারে নিহত ছেলেটির পরিবারের লোকজন। পুলিশ এসে তিনটি মৃতদেহের দখল নেয় আর মেয়েটির পরিবারের ১১ জনকে গ্রেপ্তার করে। হত্যার এই খরব ছড়িয়ে পড়তেই দুই সম্প্রদায়ের মানুষ একাধিক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। পুলিশ সাময়িকভাবে এই অবস্থাকে শান্ত করার চেষ্টা করেছিল। মোতায়েন হয় প্রাদেশিক সশস্ত্র বাহিনী (PAC)।

এই ঘটনার দুদিন পরে, ৩০ আগস্ট স্থানীয় বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) আর কংগ্রেস কর্মীরা একটি মুসলিম সমাবেশে কাওয়াল গ্রামের ঘটনার বিচার দাবি করে। আর স্থানীয় ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) নেতা ঐ একই দিনে হিন্দুদের উদ্দেশে উস্কানিমূলক বক্তৃতা দেন। পুলিশ বিজেপি, কংগ্রেস ও বিএসপি দলের নেতাদের বিরুদ্ধে এফআইআর করে। ২৩০ জনকে, আর একজন এমএলএ (বিজেপি) সংগীত সোমকে গ্রেপ্তার করে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, হিন্দু জাঠ দুই ভাইকে পিটিয়ে মারার দৃশ্যটির ভিডিও ক্লিপিং ছড়িয়ে উত্তেজনা বৃদ্ধি। পরে প্রমাণ পাওয়া যায় যে ঐ ক্লিপিংটি ইউটিউব থেকে সংগৃহীত, পাকিস্থানের একটি দাঙ্গার ঘটনার ছবি।

৩১ আগস্ট হত্যার প্রতিবাদে হিন্দু জাঠেরা একটি মহাপঞ্চায়েত মিটিং ডাকে। পঞ্চায়েতে দাবি ওঠে, দুই হিন্দু ছেলের মৃত্যুর জন্য দোষীদের শাস্তি আর সামলির (মুজফফরনগরের পাশের শহর) এসপি-কে তার পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের জন্য অপসারণ করা। পরবর্তী দুটি সপ্তাহ ধরে হিংসার ঘটনা লাগামহীন চলতে থাকে। ৬ সেপ্টেম্বর বিজেপি মুজফ্‌ফরনগর বন্ধ ডাকে। ঐদিন অবস্থা অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। মহল্লায় আগুন ধরানো, পাথর ছোঁড়া ও হিংসাত্মক আক্রমণে একজন টিভি সাংবাদিক রাজেশ ভার্মা ও একজন পুলিশ নিয়োজিত ফটোগ্রাফার (ইশরার) মারা যায়।

৭ সেপ্টেম্বর জাঠ সম্প্রদায়ের ডাকা মহাপঞ্চায়েতে মুজফ্‌ফরনগর থেকে ২০ কিমি দূরের নাগলামান্দুরের মিটিং-এ উত্তরপ্রদেশ-হরিয়ানা-দিল্লি থেকে প্রায় ১.৫ লাখ জাঠ কৃষক জমায়েত হয়। দাবি ছিল 'বহু বেটি সম্মান বাঁচাও'। মিটিং-এ জাঠদের ঐক্যবদ্ধ হবার ডাক দেওয়া হয় আর দুজন জাঠ ছেলের হত্যার ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়।

ঐ মহাপঞ্চায়েত থেকে ফেরার পথে স্থানীয় 'জল্লি খাল'-এর পাশে সশস্ত্র মুসলিম দুষ্কৃতিকারীরা আক্রমণ চালায়। আক্রমণকারীরা আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ছিল। তারা ১৮টি ট্রাক্টর ট্রলি ও ৩টি বাইক পুড়িয়ে দেয়। পুলিশের উপস্থিতিতেই এই আক্রমণের ঘটনা ঘটে, আর তারা ''আমাদের কোন অ্যাকশন নেবার অর্ডার ছিল না'' বলে সাফাই গায়। যদিও ৬টি মৃতদেহ উদ্ধার হয় ও শতাধিক মানুষ নিখোঁজ থাকে।

জল্লিখালের দাঙ্গার পরই জাঠেরা মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালায়। ফলে মুজফ্‌ফরনগর ও পাশ্ববর্তী সামলি গ্রামে নিহত হয় ৪৩ জন। আহতের সংখ্যা ৯৩ জন।

রাজ্য সরকার ৫ জন পুলিশ আধিকারিককে সঠিক কাজ সময়মত না করার অভিযোগে বদলি করে। জারি হয় কার্ফু, নামে ২০০০ সেনা আর ১০ হাজার প্রাদেশিক সশস্ত্র বাহিনী, ১৩০০০ সিআরপিএফ ও ১২০০ র‍্যাফ। ১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ১০-১২ হাজার মানুষ গ্রেপ্তার হয়। ২৩০০টি আর্মস লাইসেন্স বাতিল করা হয় এবং ২০০০ অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে গ্রেপ্তার হয় ৭ জন। গৃহহীন ৫০ হাজারের মতো মানুষের জন্য রিলিফ ক্যাম্প খোলা হয়।

ইতিমধ্যে বিএসপি, বিজেপি, আরএলডি ও বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনগুলি ক্ষমতাশীল সমাজবাদী পার্টিকে অপসারণের ও রাষ্ট্রপতি শাসন জারির দাবি তোলে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সিন্ধে অখিলেশ যাদবকে সতর্কতা জানান। অখিলেশের সরকার সময়মত ব্যবস্থা নিলে বড় সংঘর্ষ অবশ্যই এড়ানো যেত, এই সমালোচনার ঝড় ওঠে। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের সংখ্যলঘু দপ্তরের মন্ত্রী আজম খান জেলা প্রশাসনের উপর অনাস্থা প্রকাশ করেন। আগামী ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে সমাজবাদী পার্টির দলীয় প্রার্থী সোমনাথ শাস্ত্রী বাগপত কেন্দ্র থেকে তার নাম প্রত্যাহার করেন।

এক মাসের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে আরো ৪টি জেলায়। মিরাট জেলায় বিজেপি নেতা সংগীত সিং সোমকে ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে মহাপঞ্চায়েত ডাকে বিজেপি সমর্থকেরা। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে একজন মারা যায়, ২০জন আহত হয়। আরো একজন বিজেপি

এমএলএ-কে উস্কানিমূলক বক্তৃতার জন্য গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ঘটনার একমাস পরে অব্যাহত দাঙ্গায় যেমন প্রাণ যায় অসংখ্য মানুষের, তেমনি গৃহহীন হয় ৪০ হাজার মুসলমান।

১৬ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্ট কয়েকজনের আবেদনের ভিত্তিতে ২৭ আগস্টের পর থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঘটা ৯৯টি দাঙ্গার তথ্য জানতে চাইলে রাজ্য সরকারের দেওয়া হিসেবে জানা যায় এখনো পর্যন্ত যে ৪৬ জন মুসলিম ও ১৬ জন হিন্দু মারা গিয়েছে। তাদের মধ্যে ৩৭জন মুসলিম ও ১৫ জন হিন্দু নিহত হয়েছে শুধু মুজফ্‌ফরনগরের দাঙ্গায়। অন্যান্য জেলাগুলি হল সামলি, মিরাট, বাগপত ও সাহারানপুর। এটাও জানা যায় যে, ১২৮টি সংঘর্ষে ৬১৫ জন হিন্দু ও ২৬১ জন মুসলিমের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হলেও পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে ২৪৩ জনকে, যার মধ্যে ১৮৩ জন হিন্দু ও ৬০ জন মুসলিম।

সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যকে ও একইসঙ্গে কেন্দ্রের সরকারকে দাঙ্গার কারণ ও দোষীদের খুঁজে বার করতে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয়। একই সাথে গৃহহীন মানুষদের নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ উদ্বেগ দেখে রাজ্যসরকারের পক্ষে জানানো হয় যে প্রয়োজনীয় সাহায্য সবই দাঙ্গা কবলিত গৃহহীনদের দেওয়া হচ্ছে এবং তারা যাতে নির্বিঘ্নে বাড়ি ফিরতে পারে তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এটাও জানানো হয় যে, রিলিফ ক্যাম্পের সংখ্যা ৫০টি থেকে কমে ৩৩টি হয়েছে কিন্তু এখনো ১৭২০০ জন রিলিফ ক্যাম্পে আছে। একজন আবেদনকারী জানায় যে, ৩২টি গ্রামে এখনো অস্ত্রশস্ত্র মজুত আছে। এগুলো দাঙ্গার জন্য আবারও কাজে লাগানো হবে। সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারকে এই অভিযোগ খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলে। এদিকে সরকার ১৭ সেপ্টেম্বর কার্ফু তুলে নেয় ও দাঙ্গা-বিধ্বস্ত এলাকায় সেনাবাহিনীর টহলও বন্ধ করে।

একমাস পরে ২০ অক্টোবরের একটি রিপোর্টে জানা যায় যে, অনেকগুলি ক্যাম্প বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, কারণ দাঙ্গা কবলিত রিফ্যুইজিরা তাদের গ্রামের বাড়িতে চলে গেছে। কিন্তু আসলে গৃহহীনরা ক্যাম্প ছেড়ে চলে গেছে সরকারি সাহায্য বন্ধ করে দেওয়ায়। তারা ক্যাম্পেরই পাশের কোন গ্রামে থাকছে জীবিকার সন্ধানে।

জানা গেল, মুসলিমরাই বেশি করে দাঙ্গা বিধ্বস্ত গ্রামে ফিরতে চাইছে না। কিছু গ্রামে জাঠেরা চেষ্টা করেছে মুসলিমদের তাদের নিজস্ব গ্রামে ফিরিয়ে আনতে। কেননা আখ চাষ প্রধান গ্রামগুলিতে চাষের লোক সব চলে যাওয়ায় চাষে খুবই বিঘ্ন দেখা দিয়েছে। কিছু গ্রামে মুসলিম অধিবাসীরাই আশ্রয় তৈরি করেছে, কোথাও ইটভাটার মালিকরা মুসলিম রিফ্যুইজিদের তাদের ইটভাটার কাজে লাগাচ্ছে। রাজ্য সরকারের সাহায্যের আশায় থেকে হতাশাগ্রস্তদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে এখন সাধারণ মানুষরাই। রাজনীতির লোকজন যখন দাঙ্গা পীড়িতদের নিয়ে ফুটবল খেলছে নিজেদের ফায়দা লোটার ধান্দায় তখন জীবন থেমে থামেনি। মুজফ্‌ফরনগর থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে খামপুর নামের একটি গ্রামে ১৩০ জন মুসলিম ছেলে-যুবক-বয়স্করা দলবদ্ধভাবে তৈরি করছে ১০০টি ঘর। জায়গা দিয়েছে স্থানীয় মুসলিমেরা। তৈরির খরচা দিচ্ছে জামাত-উলেমা-ই-হিন্দ নামক সংগঠন। দাঙ্গাপীড়িতরা ঐ বাড়িগুলি বিনা খরচায় পাবে। একই ধরনের কলোনি তৈরি হচ্ছে আরো চারটি গ্রামে। অবশেষে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ১৮০০ মুসলিম পরিবার, যারা দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকায় আর ফিরতে চাইছে না, তাদের পরিবার পিছু ৫ লাখ টাকার অর্থ সাহায্য দেওয়া হবে। দাঙ্গাবিধ্বস্ত উত্তরপ্রদেশে দাঙ্গা লাগার ২টি মাস পরে এটাই সামাজিক চিত্র। এদিকে সামনে ২০১৪ সালে লোকসভার ভোট। ফলে রাজনীতি মেরুকরণের হিসাব করতে সব প্রতিপক্ষের নেতারা হাজিরা দিচ্ছেন মুজফ্‌ফরনগর সহ অন্যান্য দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকায়। একদিকে কংগ্রেসের সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে যেমন সহানুভূতির ডালি হাতে গেছেন, তেমন বিজেপি-র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদী গিয়ে দরিদ্রতম এলাকা বুন্দেলখণ্ডের সভায় বলছেন, ''আমি এসেছি তোমাদের চোখের জল মোছাতে।'' তিনি রাহুল গান্ধীর সাম্প্রতিক আবিষ্কার মুজাফ্‌ফরনগরের মুসলিম যুবকদের সাথে পাকিস্থানি আইএসআই-এর যোগাযোগের তথ্যকে আক্রমণ করে কংগ্রেসের ভাইস-প্রেসিডেন্টের সহানুভূতিকেই প্রশ্ন করেছেন।

রাজ্য সরকারের ভূমিকা

ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় রাজ্য (জনসংখ্যার ভিত্তিতে) উত্তরপ্রদেশ ভারতীয় রাজনীতিতে বিশিষ্ট স্থান নিয়েছে একদিকে ৮০টি লোকসভার আসনের জোরে, আরেকদিকে নেহরু-গান্ধী পরিবারের বংশধরদের নির্বাচন কেন্দ্র হিসাবে। অটলবিহারী বাজপেয়ী ও ইন্দিরা গান্ধীর আবাসস্থল ছিল এই রাজ্যেই। ২০১২ সালের বিধানসভার নির্বাচনে সমাজবাদী পার্টি নিরঙ্কুশ প্রাধান্যে জয়লাভ করে ও সবচেয়ে কমবয়সী একজন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব রাজ্যের দায়িত্ব নেন। তিনি প্রথমেই রাজ্য থেকে POTA (Prevention of Terrorism Act) তুলে নেন আর সুশাসনের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তাঁর আমলেই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ১২টি দাঙ্গা হয়, মারা যায় ২৫ জন।

মুজফ্‌ফরনগর জেলাটি মুসলিম অধ্যুষিত (জনসংখ্যার ৪৭ শতাংশ), যদিও তাদের বেশিরভাগই জীবিকায় খেতমজুর, জমি-মালিকের সংখ্যা কম। জমির মালিক বেশিরভাগই জাঠ সম্প্রদায়ের। নির্বাচিত লোকসভা সদস্য কাদির রানা বহুজন সমাজবাদী পার্টির। এই জেলাতেই বিজেপি-র প্রার্থী পরপর তিনবার জয়লাভ করেছিল।

উত্তরপ্রদেশের সবচেয়ে বড় এই দাঙ্গার সময়ে হিংসা দমনে

অখিলেশ যাদব সরকার সময়োচিত পদক্ষেপ না নেবার কারণে মুসলিমরা সমাজবাদী পার্টির বিরুদ্ধে চলে যায়। ফলে কংগ্রেস ফাঁকা জমি দখলে নেমে পড়ে। পাশাপাশি বহুজন সমাজ পার্টিও এই সুযোগে মুসমিল ভোটারদের মন জয় করার চেষ্টা চালায়। কেননা মায়াবতীর রাজত্বে চূড়ান্ত দুর্নীতি থাকলেও জাঠদের সঙ্গে মুসলিমদের সম্পর্ক ছিল শান্তিপূর্ণ। এদিকে এই আসনে বিজেপি অতীতে পরপর তিনবার জয়লাভ করার সূত্রে এখনই রাজনৈতিক ফয়দা লোটার খেলায় মেতে উঠেছে। বহু যুগের পর জঘন্যতম এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উত্তরপ্রদেশে তাই অনেক রাজনীতিবিদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে।

ইতিহাস মনে রেখে

বৃহত্তম 'গণতন্ত্রের' এই দেশ ভারতবর্ষ। এই দেশে কিন্তু সামাজিক হিংসা চলতেই থাকে। সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের, রাজনৈতিক দলের সাথে অন্য রাজনৈতিক দলের এবং অবশ্যই রাষ্ট্রের সাথে আমজনতার। প্রতিটি হিংসাশ্রয়ী ঘটনা পরিকল্পিত এবং বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রোণিত। কোন একজন মানুষের স্বার্থে আরেকজন মানুষের উপর হিংসা চাপিয়ে দিয়ে শান্তির ললিতবাণী ছড়ানো হয়। মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় দাঙ্গাগুলি হয়েছে বিহারে ১৯৪৬ সালে, গুজরাটে ১৯৬৯ সালে আর ২০০২ সালে, মুম্বাইতে ১৯৯২ সালে। এছাড়া বিহারের ভাগলপুরে ১৯৮৯ সালে, ভিওয়ান্দীতে ১৯৪৮ সালে। আর স্বাধীনতার শুরুর আগে ১৯৪৬ সালে কলকাতা দেখেছে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে'।

সরকারি চিন্তাভাবনা

সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ একটি সামাজিক মহীরূহে পরিণত হয়েছে। একে সমূলে বিনাশ করার উপায় না খুঁজে, সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সূত্র না খুঁজে, একে লালন করাটাই যেন গণতান্ত্রিক নীতি। তাই ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গার পর বিভিন্ন সামাজিক স্তর থেকে দাবি ওঠায় একটি বিল, 'প্রিভেনশন অফ কম্যুনাল অ্যান্ড টার্গেটেড ভায়োলেন্স (অ্যাকসেস টু জাস্টিস এন্ড রিপারেশন) বিল ২০১১', যা এতদিন প্রস্তাব আকারে ছিল সেটি অক্টোবরে পেশ করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদাম্বরম। মুজফ্ফরনগরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরপরই সামাজিক স্তরে তীব্র প্রতিক্রিয়া ওঠায় এবং ২০১৪ সালের ভোটযুদ্ধে জেতার চেষ্টায় বিলটিকে আইনে পরিণত করতে আইনমন্ত্রীর কাছে মতামতের জন্য পাঠানো হয়েছে। উদ্দেশ্য, আগামী শীতকালীন লোকসভা অধিবেশনে বিলটিকে সর্বসম্মতভাবেই দাঙ্গাবিরোধী আইনে পরিবর্তিত করা। বিজেপি তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বিলের বিরুদ্ধে। বিলটি নাকি সংখ্যাগুরুদের পক্ষে ক্ষতিকারক!

* তথ্যের জন্য সাহায্য নেওয়া হয়েছে The Indian Express এবং Times of India-র আগস্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের বিভিন্ন সংখ্যা থেকে।

* মতামত তৈরিতে সাহায্য নেওয়া হয়েছে 'Kafila' প্রকাশিত ১৮ সেপ্টেম্বরের 'Mujaffarnagar 2013 – Violence by Political Design – a Report by Nivedita Menon, Centre for Policy Analysis থেকে।

তড়িৎ চৌধুরী

ঘটনাপ্রবাহ

আমেরিকার সাম্প্রতিক 'শাট-ডাউন'

আমেরিকার সরকারি 'শাট-ডাউন' বলতে বোঝায় যথাসময়ে মার্কিন কংগ্রেসে সরকারি ব্যয় অনুমোদন পেতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে সরকারি ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল ক্ষেত্রগুলির কাজকর্ম সাময়িকভাবে বন্ধ হওয়া। গত ১৯৭৬ থেকে ২০১৩ অবধি ৩৭ বছরে আমেরিকায় এমন ১৮টি শাট-ডাউন ঘটেছে। অর্থাৎ গড়ে প্রতি দুবছরে একটি। ১৯৯৫-১৯৯৬ এর শাট-ডাউন ছিল দীর্ঘতম— ২১ দিন ব্যাপী। অক্টোবর ২০১৩'র এই সাম্প্রতিক শাটডাউন ছিল ১৭ দিনের।

এই ঘটনার তাৎক্ষণিক এবং দৃশ্যত কারণ আমেরিকার দলীয় রাজনীতি। মার্কিন কংগ্রেসে সরকার বিরোধী রিপাবলিকান পার্টি ২০১৩-১৪'র বাজেটের বিরোধিতার ফলে এই বাজেটের বিভিন্ন খাতে প্রস্তাবিত সরকারি ব্যয়ের অনুমোদন না পাওয়া। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল স্বাস্থ্য প্রকল্প খাতে প্রস্তাবিত বিপুল ব্যয়।

যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক বছর শুরু হয় প্রতি বছর ১ অক্টোবর। বাজেট প্রস্তাব আইন হিসেবে গৃহীত হতে গেলে কংগ্রেসের উভয়পক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন। যদিও গত নির্বাচনে ওবামার নেতৃত্বে ডেমোক্রাটরা সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়, হাউস অফ রিপ্রেজেন্টিভ্স-এ ২৩২-২০০ আসনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে রিপাবলিকান পার্টি ডেমোক্রাটদের সঙ্গে আংশিকভাবে ক্ষমতা ভাগাভাগি করার সুযোগ পায়। ফলে বাজেট প্রস্তাব পাস করাতে হলে দুপক্ষের মধ্যে বোঝাপড়া প্রয়োজন। রিপাবলিকানরা সরকারে আংশিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার ফলে সরকারি ব্যয় সংক্রান্ত নানান প্রশ্নে দু'পক্ষের মতবিরোধ সামনে আসতে থাকে। প্রধানত 'পেশেন্ট প্রোটেকশান' ও 'ডবল কেয়ার এ্যাক্ট' (যা ওবামা কেয়ার নামে বহুল পরিচিত), এগুলিকে কেন্দ্র করেই তীব্র মতবিরোধ গড়ে ওঠে। এরই ফলশ্রুতিতে ১লা অক্টোবর ২০১৩ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বাজেট পাস করতে ব্যর্থ হয়, বাজেট আলোচনা স্থগিত রাখা হয় ও 'শাট-ডাউন' ঘটে। ৮ লক্ষ সরকারি কর্মচারীর বেতন আটকে যায় এবং আরও ১৩ লক্ষ কর্মচারীর বেতন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। সরকারি অনুদানের উপর নির্ভরশীল নানা ধরনের

পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিতে হয়।

এই নাটকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আমেরিকার সরকারি ঋণের উর্ধ্বসীমা বৃদ্ধির বিষয় নিয়ে তৈরি আর একটি নাটক। এই নাটকটির সূত্রপাত হয়েছিল ১ অক্টোবরের অনেক আগে থেকেই। ২০১৩ সালের মে মাসে মার্কিন কংগ্রেসের অধিবেশনে যখন ঋণের উর্ধ্বসীমা বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিতর্ক চলছে তখন থেকেই মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টকে 'অস্বাভাবিক পদ্ধতি'র মাধ্যমে মার্কিন সরকারকে অর্থ যোগান দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হয়। এই অবস্থা কিছুদিন চলার পর আগস্ট মাসে ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট মার্কিন কংগ্রেসকে জানিয়ে দেয়, অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে সরকারকে অর্থ যোগান দেওয়ার 'অস্বাভাবিক পদ্ধতি'ও অসম্ভব হয়ে পড়বে। আর সেপ্টেম্বর মাসে তারা নির্দিষ্টভাবে জানায়, ১৭ অক্টোবরের মধ্যে ঋণের উর্ধ্বসীমা বৃদ্ধির বিষয়টি কংগ্রেসের অনুমোদন না পেলে ভয়াবহ সংকটের সৃষ্টি হবে। কারণ ঐ সময়ের মধ্যে আমেরিকান সরকারের ওপর জমা ঋণের ভার ১৬.৬৯৯ ট্রিলিয়ন (১ ট্রিলিয়ন = ১ লক্ষ কোটি) ডলারের উর্ধ্বসীমাটি স্পর্শ করবে। অর্থাৎ আমেরিকান সরকার আরও ঋণ নেওয়ার যাবতীয় ক্ষমতা হারাবে। ফলে তার যাবতীয় ব্যয়, এমন কি জমা ঋণের ওপর সুদ দেওয়ার ক্ষমতাও থাকবে না— এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হবে। মার্কিন সরকার ডিফল্টার হিসেবে চিহ্নিত হবে। তাই ঋণের উর্ধ্বসীমা বাড়ানোর বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এর জন্যও প্রয়োজন ছিল কংগ্রেসের অনুমোদন। অর্থাৎ, বিরোধী রিপাবলিকান সদস্যদেরও অনুমোদন।

এই দুটি পরস্পর যুক্ত বিষয়ই দলীয় রাজনীতির আবর্তে সৃষ্টি করে এই সাময়িক 'শাট-ডাউন'। প্রেসিডেন্ট ওবামা ২রা অক্টোবরই ঘোষণা করেন ঋণের উর্ধ্বসীমা বাড়ানোর বিষযটিতে রিপাবলিকানরা রাজি না হলে বাজেট সংক্রান্ত কোন আলোচনাই হবে না। ফলে এই সাময়িক 'শাট-ডাউন' অবসানের ক্ষেত্রে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। অবশেষে রাজনৈতিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়েই এই সাময়িক শাট-ডাউনের অবসান হয় ১৭ই অক্টোবর। (১৭ই অক্টোবর ছিল চরম সময়সীমা)। দুই বিরোধী পক্ষ একটি সাময়িক ও আংশিক মতৈক্যের ভিত্তিতে জানুয়ারি ২০১৪ অবধি বাজেট-ব্যয় অনুমোদন করে এবং ৭ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ওবামা সরকার ঋণের উর্ধ্বসীমার ওপর ঋণ নেওয়ার অনুমোদন পায়।

আমেরিকার সাম্প্রতিক 'শাট-ডাউন' সাময়িক একটি রাজনৈতিক প্রহসনের চেহারা নিলেও ঘটনাটি আর একবার আমেরিকান অর্থনীতির তথা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির গভীর দুর্বলতার দিকটি স্পষ্ট করে তুলেছে। বিপুল বাজেট ঘাটতি ও ঋণের ওপর চূড়ান্ত নির্ভরতা এই অর্থনীতির অন্তর্নিহিত ভারসাম্যহীনতারই পরিচয় দেয়। ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক মন্দার কারণে মার্কিন সরকার গভীর আর্থিক চাপের মধ্যে পড়ে। সে দেশের সরকারি তথ্যসূত্রগুলি থেকে জানা যায়, একদিকে মন্দা ও বেকারি বৃদ্ধির কারণে ব্যক্তিগত ব্যবসাবাণিজ্যের আয়ের ওপর কর থেকে প্রাপ্য সরকারি আয়ের উল্লেখযোগ্য হ্রাস, অন্যদিকে যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়ের বিপুল বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বেকারভাতা, বেকারত্ব বিমা ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি। ২০০১ সালের মার্কিন বাজেটই শেষ বাজেট যা আয়-ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে পেরেছিল। ২০০১ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে বাজেটে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়ায় জিডিপি-র শতকরা ৪.৫ ভাগ। ঐ সময়ের মধ্যে সরকারি আয়ের পরিমাণ ছিল জিডিপি-র শতকরা ৩.৭ ভাগ। যার ফলে বাজেট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় জিডিপি-র ৭ শতাংশ। এই সময়কালের মধ্যে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বৃদ্ধি ঘটে জিডিপি-র শতকরা ১.৩ ভাগ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'সন্ত্রাসবাদী'দের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যয়। ২০১১ সালে অর্থনীতিবিদ পল ক্রুগম্যান আমেরিকান ক্রমবর্ধমান বাজেট ঘাটতি ও ঋণের পরিমাণ ক্রমবৃদ্ধির কারণ হিসেবে একদিকে করের পরিমাণ হ্রাস অন্যদিকে ইরাক ও আফগানিস্থানে যুদ্ধের বিপুল ব্যয় ও মন্দার কারণে আর্থিক বৃদ্ধির হ্রাস, ফলে সরকারের আয়ের নিম্নগতি ও বেকারি বিমা ও অন্যান্য সামাজিক খাতে ব্যয়ের বৃদ্ধিকেই মূলত দায়ী করেছেন। অথচ অর্থনীতির সংকটের কারণে মানুষের যে দুরবস্থা সেখানে কিছু কিছু জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপ না নিলে নির্বাচনে জেতা কঠিন। এই দ্বিমুখী সংকটে পড়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা তার প্রেসিডেন্ট ওবামা।

এই ক্রমবর্ধমান বিপুল বাজেট ঘাটতির কারণে আমেরিকান সরকারের দৈনন্দিন ব্যয় মেটানোর জন্যই ক্রমাগত ঋণ নিতে হয়। ১৬ই অক্টোবর ২০১৩'র পরবর্তী সপ্তাহে পূর্বনির্ধারিত উর্ধ্বসীমা (১৬.৬৯৯ ট্রিলিয়ন ডলার) ছাড়িয়ে গেছে। এই সময়ে আমেরিকার জনগণের মাথাপিছু ঋণের বোঝা ৫০,০০০ ডলারের বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত সেপ্টেম্বর ২০১২-র পরবর্তী সময়ে আমেরিকান সরকারের ঋণের পরিমাণ বেড়েছে প্রতিদিন গড়ে ২৫ লক্ষ ডলার। পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক অর্থনীতির সঙ্গে একদিকে আধিপত্যবাদ ও যুদ্ধ অন্যদিকে মন্দা-বেকারি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে রয়েছে। তাই বাজেট ঘাটতি ও ঋণের বোঝার ক্রমাগত বৃদ্ধি এই অর্থনীতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা দিচ্ছে। তাই, এই ধরনের সংকটের বারংবার পুনরাবৃত্তিটাই স্বাভাবিক। এই ব্যবস্থার মধ্যে আমেরিকার জনগণের কাছে এই পরিস্থিতি থেকে বরাবরের জন্য মুক্তির কোন সম্ভাবনা নেই।

অপরাজিতা মুখার্জী

ঘটনাপ্রবাহ

মমতার রাজনীতি ও রাজ্যপাট

হেগেল সাহেবকে অনুসরণ করে কার্ল মার্কস একদা মন্তব্য করেছিলেন, "বিশ্ব ইতিহাসের অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও ব্যক্তিরা যেন দুবার হাজির হয়। প্রথমবার আসে বিয়োগান্ত নাটকের রূপে, দ্বিতীয়বার প্রহসন হিসাবে।" অমোঘ এক উক্তি। ফ্রান্সের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন প্রসঙ্গে কার্ল মার্কস যা বলেছিলেন, বেঁচে থাকলে হালফিলের পশ্চিমবঙ্গ প্রসঙ্গেও তিনি যে একই মন্তব্য করতেন, এটা নিশ্চিত।

১৯৭৭ সালের নির্বাচনে সিপিআইএম-এর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট যখন পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ক্ষমতা দখল করেছিল, তখন টানা তিন দশক কেন, সম্ভবত এক দশকের জন্যও ক্ষমতায় টিকে থাকা সম্বন্ধে তারা নিশ্চিত ছিল না। ভারতবর্ষের তদানীন্তন পরিস্থিতিতে বামপন্থী কোন দলের পক্ষে সরকার গঠন করে টিকে থাকার রেকর্ড তখনও পর্যন্ত বেশ খারাপ। কেরালায় নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বে দু'বার বামপন্থী সরকার গঠিত হলেও, কোনওবারই পুরো মেয়াদ টিকতে দেওয়া হয়নি। পশ্চিমবঙ্গেও ইতিপূর্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার দু'বার ক্ষমতায় এসেছিল। দিল্লীর নির্দেশে দুবারই সরকার খারিজ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু '৭৭ সালের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ভারতের মূল শাসক দল কংগ্রেসের অবস্থা একেবারেই কাহিল হয়ে যাওয়ার ফলে দিল্লীর শাসনতন্ত্রে বেশ বড়ো রকমের রদবদল ঘটে। বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষেত্রে সম্ভবত তাই অতীতের পুনরাবৃত্তি দেখা যায়নি।

কিন্তু তখন উপলব্ধি করা না গেলেও, আজ বোঝা যায়, বামফ্রন্ট সরকারের আদি পর্বেই তাদের শেষের শুরুর কাহিনীটা রচিত হয়ে গিয়েছিল। ১৯৭৯ সালে মরিচঝাঁপিতে নিরস্ত্র বাস্তুহারা মানুষের উপর নির্বিচার গুলিবর্ষণ, পুলিশের অমানুষিক অত্যাচার এবং গণ-উচ্ছেদের কাহিনীর মধ্যেই নিহিত ছিল ভবিষ্যৎ নন্দীগ্রামের সম্ভাবনা। প্রায় তিন দশক ব্যবধানের দুটি ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে বার করাটাকে অনেকে বাড়াবাড়ি মনে করতে পারেন। কিন্তু প্রান্তিক মানুষের জীবন ও চাহিদার প্রতি তীব্র উপেক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বর্বরোদ্ধত প্রকাশের নজির দুটো ঘটনাই।

পশ্চিমবঙ্গের শাসনতন্ত্রে দ্বিতীয় পরিবর্তনে বামফ্রন্টের স্থলাভিষিক্ত হলো কংগ্রেসেরই দলছুট একটা অংশ। তৃণমূল দল। বলা ভালো, বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গ থেকে উৎপাটিত হলো। ঠিক ১৯৭৭ সালে যেমনটা হয়েছিল কংগ্রেস। ট্র্যাজেডি হচ্ছে এটাই, বামফ্রন্টের পরাজয় ঘটেছিল বামপন্থার ছকেই।

ভারতবর্ষে সংসদীয় রাজনীতিতে আঞ্চলিক দলগুলির ভূমিকা ও প্রভাব অনস্বীকার্য। জাতি-বর্ণ-সামাজিক-প্রাদেশিক বৈষম্যকে কেন্দ্র করে অথবা এই সংক্রান্ত ইস্যুগুলির ভিত্তিতে আঞ্চলিক দলগুলির উত্থান। তৃণমূল দলের ক্ষেত্রে বিষয়টা কিন্তু ভিন্ন। এই সমস্ত বিষয়গুলির কোনটাই তৃণমূলের এজেন্ডায় ছিলনা। শুরু থেকেই তৃণমূলের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু সিপিআইএম তথা বামফ্রন্ট বিরোধিতা এবং সামগ্রিকভাবে বামপন্থার বিরোধিতা।

১৯৯৮ সালে তৃণমূল দলের যখন জন্ম, সিপিআইএম তথা বামফ্রন্ট ততদিনে কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া উদারনৈতিক নীতিতে সামিল হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে নয়া শিল্পনীতি গৃহীত হয়েছে। সরকারের কৃষিনীতি, শ্রমনীতিতে বামপন্থী ভাবধারা ক্রমশ অপসৃয়মান। রাজ্য জুড়ে প্রমোটার রাজ কায়েম হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের নগরায়ন প্রকল্পে উচ্ছেদ হচ্ছে হাজার হাজার কৃষক।

মতাদর্শগতভাবে মমতা ব্যানার্জি এই উদারনৈতিক অর্থনীতির বিরোধী ছিলেন না। সিপিআইএম-এর দলতন্ত্র এবং বলতন্ত্রের বিরোধিতা ছিল মমতা ব্যানার্জির রাজনীতির মুখ্য বিষয়। সিপিআইএম তথা বামফ্রন্টকে ক্ষমতা থেকে অপসারণই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য।

বস্তুত মমতা ব্যানার্জির রাজনীতিতে আদর্শের সন্ধান করা বৃথা চেষ্টা। সিপিআইএম-এর পেশীশক্তির আস্ফালনে সেই সময়ে পশ্চিমবঙ্গ ছিল সন্ত্রস্ত। এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভটাকেই মমতা ব্যানার্জি তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে মূলধন করেছিলেন। কিন্তু মানুষের মৌলিক সমস্যা সমাধানে তাঁর রাজনীতি কোনো দিশা দেয়নি। এর প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল রাজারহাটে উচ্ছেদের ক্ষেত্রে তাঁর উদাসীন মনোভাবে। সিপিআইএম-এর সেই একছত্র আধিপত্যের যুগে রাজারহাটের উচ্ছেদ-আক্রান্ত বিক্ষুব্ধ কৃষক ২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থীকে জয় এনে দিয়েছিল। উচ্ছেদ-বিরোধী আন্দোলনে তাঁরা তৃণমূল নেত্রীর সাহায্য আশা করেছিলেন। কিন্তু না বিজয়ী বিধায়ক, না তৃণমূল নেত্রী, কেউই সেই দুঃসময়ে লড়াকু কৃষকদের পাশে দাঁড়ান নি। ফলে হারানো জমি পুনরুদ্ধার করতে সিপিআইএম-এর বেশি সময় লাগেনি।

ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তাকে ভিত্তি করে মমতা ব্যানার্জি তৃণমূল দলকে প্রধান বিরোধী দলে উন্নীত করতে সমর্থ হয়েছিলেন, কিন্তু বাংলার মানুষের চোখে বামফ্রন্টের বিকল্প হিসাবে প্রতিপন্ন করতে পারেন নি। সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রাম কিছুটা অপ্রত্যাশিত ভাবে মমতা ব্যানার্জিকে সেই সুযোগ এনে দিয়েছিল।

সিঙ্গুর আন্দোলন মমতা ব্যানার্জির কাছে যাকে বলে উইন্ডফল। এই আন্দোলন তিনি শুরু করেন নি। অধিগ্রহণ এবং

উচ্ছেদের বিরুদ্ধে তাঁর 'অসহযোগের' কথা আগে শোনাও যায়নি। সিঙ্গুর আন্দোলন, ২০০৬ সালের নির্বাচনী বিপর্যয়ের পর, মমতা ব্যানার্জিকে ঘুরে দাঁড়াবার একটা সুযোগ এনে দিয়েছিল, যার সদ্ব্যবহার তিনি সম্পূর্ণভাবে করেছিলেন। সিঙ্গুরের 'কৃষিজীবী রক্ষা কমিটির' মধ্যে সমাবেশ ঘটেছিল বামফ্রন্ট-বহির্ভূত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর। স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক শ্রী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে সামনে রেখে কমিটি আন্দোলন শুরু করেছিল। এমনকি এই সমস্ত দল ও গোষ্ঠীর কর্মীদের অনেকে পরবর্তীকালে অনশন আন্দোলনেও মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে সমান তালে অংশগ্রহণ করেছিল।

একইভাবে নন্দীগ্রামে ''ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটিতেও'' সামিল হয়েছিল একাধিক রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী ও ব্যক্তিবর্গ। বামফ্রন্ট বিরোধিতার জের ধরেই মমতা ব্যানার্জি উচ্ছেদ বিরোধী সংগ্রামে সামিল হয়ে, তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সন্ধিক্ষণে চরম বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক সাফল্য অর্জনে সমর্থ হলেন। ২০০৬ সালের তুলনায় ২০১১ সালে বামফ্রন্টের ভোট কমেছিল ৮ শতাংশ (সিপিআইএম-এর ৭ শতাংশ)। অপরদিকে তৃণমূল-কংগ্রেস জোটের ভোট বেড়েছিল ৭ শতাংশ (তৃণমূলের একক ভোট বেড়েছিল ১২ শতাংশ)। বামফ্রন্টের ভোটব্যাঙ্কের এই অবক্ষয় বুঝিয়ে দেয় যে দলীয় ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস থেকে মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা মানুষের কত তীব্র ছিল।

শাসক হিসাবে মমতা ব্যানার্জির রাজনৈতিক আচরণ বিরোধী দলনেত্রী হিসাবে তাঁর আচরণের একেবারে বিপরীত। মিল যেটা আছে, তা একনায়কতন্ত্রী হিসাবে— দলে এবং সরকারে। জনসমর্থন তাঁর ছিল, কিন্তু ছিল না সিপিআইএম-এর মতো শক্তিশালী গণসংগঠন। সর্বত্র ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে অগত্যা তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছে আমলা এবং পুলিশের উপর। আবার একই সঙ্গে ব্যক্তিগত ক্যারিস্মা প্রতিষ্ঠার আশায় সেই মমতা ব্যানার্জিকেই ছুটে বেড়াতে হয়েছে জঙ্গল থেকে পাহাড়ে। প্রশাসন কাঠের পুতুলের মতো তাঁকে অনুসরণ করেছে।

যেখানে আত্মপ্রতিষ্ঠাই একমাত্র বিবেচ্য, সেখানে গণতন্ত্রের ছায়া পড়েনা। প্রয়োজন কেবল অনুগত বাহিনীর। ইংরাজিতে যাকে বলা হয় cronyism। বাংলায় বলা যায় 'দোস্তিতন্ত্র'। দল, মন্ত্রীসভা, প্রশাসন, পঞ্চায়েত— সর্বত্র যাদের প্রাধান্য থাকবে। এমন নয় যে বামফ্রন্টের রাজত্বে 'দোস্তিতন্ত্র' বহাল ছিলনা। কিন্তু দলগত অনুশাসন আর ব্যক্তিগত অনুশাসনে প্রভেদ আছে। দলগত অনুশাসনে যে ভারসাম্য বজায় রাখা যায়, ব্যক্তিগত অনুশাসনে সেই প্রকার সুনিয়ন্ত্রণ সব সময় সম্ভব নাও হতে পারে।

গ্রামের ক্লাব থেকে শিক্ষার প্রাঙ্গন— অনুগতদের শাসন ছড়িয়ে গেছে সবখানে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মূল্যবোধকে পর্যুদস্ত করে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় লুম্পেন সংস্কৃতির এত বাড়বাড়ন্ত সম্ভবত ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। ইস্কুল-কলেজে হাঙ্গামা যদি অনুগতদের তত্ত্বাবধানে ঘটে থাকে, তাহলে তা নেহাৎই 'ছোটোখাটো' ঘটনা। 'অননুমোদিত' ঘটনায় শ্রীঘর বাস অনিবার্য। শিক্ষক নির্যাতিত হলে তিনি 'বিরোধী' দলের চর। হত্যা, সন্ত্রাস, নারী নির্যাতনের মতো ঘটনায় 'কাছের লোকদের' পুলিশ কেস লঘু হয়ে যায়। বানতলার মতো 'এমন তো কতোই হয়' (জ্যোতি বসু উবাচ) ঘটনার পুনরাবৃত্তি 'পরিবর্তনেও' বন্ধ হয়নি।

মমতা ব্যানার্জি সরকার যে গণতান্ত্রিক মতপ্রকাশের সমস্ত রন্ধ্রপথ বন্ধ করতে চাইছে, তার কারণ অবোধ্য নয়। পুঁজিকে সন্তুষ্ট করার দায় সব সরকারই গ্রহণ করে। পুঁজি যেখানে আগ্রাসী, সেখানে সরকারও আগ্রাসী। জঙ্গলমহল এখনও সামরিক বুটের তলায়। জমি অধিগ্রহণ স্থগিত রেখে বা রিটেল ব্যবসায় বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের বিরোধিতার মধ্যে যতটা চমক আছে, ততটা কার্যকারিতা নেই। ইতিমধ্যেই ভূমি সংস্কার আইন সংশোধন করে মমতা ব্যানার্জি কর্পোরেট সংস্থার অনুকূলে কৃষিজমি প্রাপ্তি সুলভ করেছেন। এবং অদূর ভবিষ্যতে তিনি যে অধিগ্রহণের পথে ফিরে যাবেন না, এমন কোনো নিশ্চয়তা কিন্তু নেই। বৃহৎ বাণিজ্যিক সংস্থাকে কৃষিপণ্য ব্যবসায়ে অংশগ্রহণে অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্তও বর্তমান মন্ত্রীসভা গ্রহণ করেছে। 'SEZ' হবে না ঘোষণা করা হলেও, শিল্পপতিদের *সেজ*-এর সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে। কর্পোরেট সেক্টরকে জায়গা করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই সরকারই তো নোনাডাঙায় ঝুপড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে।

ভারতবর্ষে এখন শুধু শিল্পপতিরাই কথা বলে না। অভিজাত শিল্প-পুঁজির বাইরে এমন এক পুঁজিপতি শ্রেণীর উত্থান হয়েছে, যাদের ধনাগম হয় ফাটকাবাজি এবং নানাবিধ অনৈতিক ব্যবসা বা ট্রেডের মাধ্যমে। শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, সারা ভারতেই শিল্প-বহির্ভূত পুঁজি শক্তিশালী হয়ে উঠছে। এ বিষয়ে প্রভাত পটনায়েকের বিশ্লেষণ প্রণিধানযোগ্য।

> ''বর্তমানে যে পুঁজিবাদ ভারতবর্ষে বিকাশ লাভ করছে, তা নেহরু যুগের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে দেখা পুঁজিবাদ থেকে ভিন্ন পথে, কৃষক ও ক্ষুদ্র উৎপাদকদের উচ্ছেদ ও নিঃস্ব করার বিনিময়ে প্রভূত পরিমাণ 'আদিম পুঁজি সঞ্চয়ের' পথ উন্মুক্ত করেছে। গ্রামাঞ্চলে অসহনীয় অবস্থার দরুণ মানুষ শহরে ভিড় করছে। কিন্তু বহুকথিত জিডিপি বৃদ্ধির অনেক গল্প শোনা গেলেও শহরে, আন্তর্জাতিক শ্রম দপ্তর নির্দ্দিষ্ট মান অনুযায়ী ভদ্রগোছের চাকরি (decent employment)

কদাচিৎ মেলে।... শহরে যারা ভিড় করছে, তারা কর্মরতদের দল ভারী করছে না, উল্টে বেকার, আংশিক-বেকার, আধা-বেকার, অনিয়মিত কর্মী এবং 'ছদ্ম বেকারের' সংখ্যা বৃদ্ধি করছে। তাদের সাধারণত অসংগঠিত সেক্টরের কর্মী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। মার্কস এদেরকেই 'শ্রমের সংরক্ষিত বাহিনী' হিসাবে অভিহিত করেছিলেন। সরকারি মুখপাত্র 'অসংগঠিত সেক্টরের' বৃদ্ধিতে গর্বিত, এটা দেখে বেশ মজা লাগছে। '৩০-এর দশকে মহামন্দার সময়ে বেকার যুবকেরা যৎসামান্য রোজগারের জন্য অনেক সময়ে জুতো পালিশের বৃত্তিও গ্রহণ করতো। এটা কী ইঙ্গিত করে, বেকারি বাড়ছে, না জুতো পালিশ বিভাগে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাচ্ছে? শহরের এইসব অভিবাসী, যারা শ্রমের সংরক্ষিত বাহিনীর স্তরে নিক্ষিপ্ত, তাদের কোনো ট্রেড ইউনিয়নে সামিল করা যায় না। এবং বাস্তব হচ্ছে যে অসংগঠিত কর্মীদের আবরণে শ্রমের সংরক্ষিত বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত এইসব মানুষের বৃহদংশ পরিষেবা ক্ষেত্রে নিয়োজিত, যেখানে ইউনিয়ন করা আরও কঠিন। ইউনিয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ না করতে পারার অর্থ, সমষ্টিগত সামাজিক জীবনযাত্রায় তাদের জীবন বিকশিত হতে পারেনা। ক্রমে ক্রমে তারা, মার্কসের বর্ণনা মতো লুম্পেন প্রলেতারিয়েত শ্রেণী গঠন করে— 'ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা পুরোপুরি বিশৃঙ্খল এক জনতা'। এই ধরনের পরিষেবা মূলক ব্যবসায়ে অনেক ক্ষেত্রে রাজনীতিক উদ্যোগপতিদের সাহায্য করার জন্য 'বাহুবলের' আশ্রয় নিতে হয়। প্রধানত জমি এবং পরিবহণ ব্যবসায় এদের দেখা মেলে। বেসরকারিকরণ ও বিভিন্ন উদ্যোগ প্রতিষ্ঠার নামে বিবিধ আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার ফলে লুম্পেন প্রলেতারিয়েতদের সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভ সহজ হয়। বিপন্ন হয় যৌথ সামাজিক জীবনযাত্রার বিকাশ। এই যুক্তি কিছুটা গ্রাহ্য যে, জাতিগত এবং আঞ্চলিক বন্ধন একপ্রকার গোষ্ঠীচেতনার জন্ম দেয়। সঙ্কীর্ণতা এবং বর্জনীয়তার প্রশ্ন বাদ দিয়েই বলছি, সেইসব উন্নয়ন প্রক্রিয়া, লুম্পেন প্রলেতারিয়েতরা যাতে বিশেষত নিয়োজিত, সেইসব উন্নয়নের অভিঘাতে এই প্রবণতাও ধূলিসাৎ হয়।... যে পুঁজিবাদ যথাযথ সর্বহারা শ্রেণীর বদলে, লুম্পেন প্রলেতারিয়েতের সংখ্যা বৃদ্ধি করে তাকে আমি লুম্পেন পুঁজিবাদ আখ্যা দিই। ('The Muck of the New-Capitalism, Classical versus Lumpen', *The Telegraph*, 11/04/13)

পট্টনায়ক কথিত এই লুম্পেন পুঁজিবাদ-এর রমরমা শুরু হয়েছে বামফ্রন্ট আমলেই। রাজারহাট, বেদিক ভিলেজে যার প্রকাশ আমরা দেখেছি। এমনকি যে চিটফান্ড ব্যবসা নিয়ে আজ এত সোরগোল উঠেছে, সেটাও প্রসার লাভ করেছে বামফ্রন্ট আমলেই। সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে এদের আনুগত্যও বদলেছে। রাইটার্স বা নবান্নে এদের গতিবিধি আজও অবাধ। মমতা ব্যানার্জির দলেও এইসব ব্যবসায়ী-পুঁজিপতির দল জায়গা করে নিয়েছে। নিজ দলের কর্মী তপন দত্তের হত্যা তার অন্যতম প্রমাণ।

কর্পোরেট সেক্টরের মদতপুষ্ট উগ্র ভোগবাদী বিনোদন সংস্কৃতি এবং লুম্পেন পুঁজিবাদের সম্মিলনে জন্ম নিয়েছে বিকারগ্রস্থ এক সংস্কৃতি যেখানে মানবিক, সামাজিক, গণতান্ত্রিক, নান্দনিক মূল্যবোধগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত। সর্বশক্তি দিয়ে মমতা সরকার মানবাধিকার কমিশনের বিরোধিতা করে চলেছে। সরকার যদি এই সংস্কৃতি ও মানসিকতাকে তোষণ করে, সমাজে তার প্রভাব পড়বেই।

৮ জুন ২০১৩ কামদুনিতে দ্বিতীয় বর্ষের এক কলেজ-ছাত্রীকে গণধর্ষণ ও নৃশংসভাবে খুন করা হয়। অপরাধীরা শাসক দলের আশ্রিত। অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে গ্রামের মানুষের সম্পূর্ণ স্ব-উদ্যোগে গড়ে ওঠে 'প্রতিবাদী মঞ্চ'। এই প্রতিবাদী মঞ্চ হয়ে উঠেছে শাসক দলের চক্ষুশূল। পাল্টা মঞ্চ করে অপরাধীকে আড়াল করার এবং অপরাধকে লঘু করে দেওয়ার অপচেষ্টা প্রথমাবধি বিদ্যমান। চাপ সৃষ্টি করে, ভয় দেখিয়ে, প্রলোভিত করে শাসক দল যে ভাবে অত্যাচারিতার পরিবারকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে, তার পূর্ব-নজির খুব বেশি নেই। এখন শুরু হয়েছে মারধর, গুণ্ডামি। ইতিপূর্বে সুটিয়াতে নিহত শিক্ষক বরুণ বিশ্বাসের পরিবারকেও অনুরূপভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। ভয়, অর্থ বা প্রলোভন দেখিয়ে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ ধামাচাপা দেওয়ার এ এক ন্যক্কারজনক প্রবণতা।

রাজনীতির ক্ষেত্রে যেখানে দেবার কিছু নেই, সেখানে দান-খয়রাতই ভরসা। লাগে টাকা দেবে সরকার। কিন্তু সরকারি পরিবহন কর্মীদের বেতন-ভাতা-পেনশন দেওয়ার ক্ষেত্রে কোষাগারের দরজা বন্ধ হয়ে যায় কেন? পরিবহন কর্মী আত্মহত্যা করলেও সেখানে মানবিকতা উবে যায় কেন? ভোটমূল্য না থাকলে কী মানবিকতাও মরে যায়? অভাবের তাড়নায় কৃষক আত্মহত্যা এ রাজ্যে, বামফ্রন্ট এবং 'পরিবর্তন', দুই আমলেই, এক রূঢ় বাস্তব। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সরকার পারিবারিক কলহের তকমা দিয়ে অভাবের অভিযোগকে নস্যাৎ করেছে। মমতা সরকার তথ্যটাকেই অস্বীকার করছে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী ২০১১ সালে এই রাজ্যে কৃষক আত্মহত্যার সংখ্যা ৮০৭। ২০১২ সালে রাজ্য সরকার ব্যুরোকে আত্মহত্যা সংক্রান্ত কোনো তথ্যই পাঠালো না। উত্তরবঙ্গে চা-বাগানে অনাহার-আত্মহত্যা চলছেই। কোনো ক্ষেত্রেই কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে সরকারি স্তরে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হচ্ছেনা। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য,

বিশেষত খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিতে মানুষ হাঁসফাঁস করছে। সমস্যাটা মূলত মজুতদারির। ব্যবস্থাটা সেখানে না নিয়ে খুচরা ব্যবসায়ীদের তাড়না করাটা মিডিয়া প্রচারের এক ভালো আইটেম হতে পারে। কিন্তু আদত অপরাধীদের গায়ে হাত পড়বে কি?

'পরিবর্তন' যে মানুষের মৌলিক সমস্যার সমাধান করতে অপারগ, এ বিষয়ে কোনো মোহ থাকার কথা নয়। কিন্তু মানুষের বাকস্বাধীনতা এত দ্রুত কেড়ে নেওয়া হবে, এতটাও ভাবা যায়নি। শাসকশ্রেণীর রিলিফ দেওয়ার ক্ষমতা যত সঙ্কুচিত হয়ে আসে, সাধারণ মানুষের অধিকারের পরিসরও তারা গণ্ডীবদ্ধ করার চেষ্টা করে। যে তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটে সাধারণ মানুষ আজ জর্জরিত, তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ-বিক্ষোভকে দমন করা ছাড়া শাসক শ্রেণীর আর কোনো পথ নেই। ক্ষমতা দখলের পর্বে মমতা ব্যানার্জি যেটুকু বামপন্থী গন্ধ গায়ে মেখেছিলেন, ক্ষমতার্জনের পর তা ধুয়েমুছে নিজেকে তাই সাফসুতরো করে চলেছেন।

আমি তো আমার শপথ রেখেছি
অক্ষরে অক্ষরে
যারা প্রতিবাদী তাদের জীবন
দিয়েছি নরক করে।
দাপিয়ে বেড়াবে আমাদের দল
অন্যে কবে না কথা
বজ্রকঠিন রাজ্যশাসনে।

সেটাই স্বাভাবিকতা।
গুলির জন্য সমস্ত রাত
সমস্ত দিন খোলা
বজ্রকঠিন রাজ্যে এটাই
শান্তি ও শৃঙ্খলা।
যে মরে মরুক, অথবা জীবন
কেটে যাক শোক করে—
আমি আজ জয়ী, সবার জীবন
দিয়েছি নরক করে।

২০০৭-এ লেখা শঙ্খ ঘোষের কবিতা, ২০১৩ সালে উদ্ধৃত করলাম। সময়টা কী বদলে গেছে মনে হচ্ছে?

পরিচয় কানুনগো

ঘটনাপ্রবাহ

নিরাপত্তারক্ষীদের নিরাপত্তাহীনতা

১১ নভেম্বর ২০১২ কলকাতায় শর্ট স্ট্রিটে এক টুকরো জমির দখল নিয়ে গুলি-গোলা চলে। ফলে দু'জন যুবক নিহত হন। পিকলু আচার্য ও প্রসেনজিৎ দে। গুলিচালনায় যুক্ত মহিলা ও তাঁর দেহরক্ষী গ্রেপ্তার হয়েছেন। এছাড়াও গ্রেপ্তার হয়েছেন প্রাইভেট সিকিউরিটি এজেন্সিতে কর্মরত কয়েকজন যুবক-যুবতী। জমি নিয়ে গণ্ডগোলের সূত্র ধরে গ্রেপ্তার হয়েছেন আরও অনেকে। সংবাদপত্রে পুলিশের সঙ্গে যোগসাজসের অভিযোগ এসেছে। অভিযোগ এসেছে রাজনৈতিক যোগ-সাজসের। পিকলু এবং প্রসেনজিৎ ছিলেন তাঁদের পরিবারের আয়ের মূল উৎস অর্থাৎ প্রধান রোজগেরে ব্যক্তি।

সংবাদে এটাও প্রকাশিত হয়েছে যে প্রসেনজিৎ ও পিকলুর পরিবার জানতেন না তাঁরা ঠিক কী কাজ করতেন। সম্প্রতি এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে দাবি করেছেন গত দু'বছরে তিনি আড়াই লাখ বেকারের চাকরি দিয়েছেন, আমাদের জানা নেই পিকলু ও প্রসেনজিৎ তাঁদের মধ্যে ছিলেন কিনা। তাঁরা করতেন সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি। আর কর্মরত ছিলেন প্রাইভেট সিকিউরিটি এজেন্সিতে। আর আমরা গুরত্ব দিতে চাইছি এই প্রাইভেট সিকিউরিটি এজেন্সিগুলির ব্যবসার প্রতি।

১৯৮৮ সালে নিউইয়র্ক টাইমস্ বলেছিল ভারতের প্রাইভেট সিকিউরিটি শিল্প কয়েক মিলিয়ন ডলারের ব্যবসা। অ্যাসোচেম-অ্যাভিওটেক : ২০১১-র তথ্য অনুযায়ী প্রাইভেট সিকিউরিটি শিল্পে প্রায় ৯৫ লাখ শ্রমিক-কর্মচারী নিযুক্ত আছে। ছোট-বড় আবাসনে গার্ডের কাজ, প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি, কারখানায় বা পানশালায় বা সরকারি-বেসরসকারি হাসপাতাল-নার্সিংহোমে কর্মরত বাউন্সার ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত আছেন এঁরা। সিসিটিভি, মেটাল ডিটেক্টর ও উপরে বর্ণিত প্রাইভেট সিকিউরিটি এজেন্সির কাজগুলি নিয়ে ২০১১-র অ্যাসোচেমের তথ্য অনুযায়ী এই শিল্পে মোট ব্যবসার পরিমাণ ৩২ হাজার কোটি টাকা। অ্যাসোচেমের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এই শিল্পে বর্তমানে বৃদ্ধির হার ৩০ শতাংশ।

বিনিয়োগের এমন লাভজনক ক্ষেত্র দেখে উৎসাহিত হয়েছেন বহুজাতিক করপোরেশনগুলিও। পৃথিবীর বৃহত্তম প্রাইভেট সিকিউরিটি কোম্পানি সুইডেনের সিকিউরিটাস এবি (Securitus AB) ভারতের ওয়ালসন সার্ভিসেসের ৪৯ শতাংশ শেয়ার হস্তগত করে ২০০৭ সালে। বহুজাতিক পিনকারটন ২০০৬ সালে ভারতের প্রাইভেট সিকিউরিটির বাজারে প্রবেশ করে। ২০১২ সালে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম কোম্পানি স্পেনের প্রসেগুর (Prosegur) দেশজ কোম্পানি সিস (SIS)-এর সাথে জয়েন্ট ভেনচার শুরু করে।

অন্যদিকে এই শিল্পে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের অবস্থা ভয়াবহ। দিল্লির ওখলা-নয়ডা ২০০ সিকিউরিটি গার্ডের মধ্যে

এর পর ২৫ পৃষ্ঠায়

প্রতিবেশী দেশ

তাপ বিদ্যুতের বহু বিকল্প আছে, সুন্দরবনের কোন বিকল্প নাই

আনু মুহাম্মদ

বিশেষজ্ঞ-মত ও জাতীয় জাগরণ উপেক্ষা করে গত ৫ অক্টোবর, নির্ধারিত তারিখের ১৭ দিন আগে, ২৫০ কিমি দূর থেকে রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে রামপালে সেই ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের ভিত্তিফলক উন্মোচন করেছেন। একটি লংমার্চের মধ্য দিয়ে সুন্দরবন রক্ষার জাতীয় জাগরণের মুখে এটা বেশ চাতুর্যপূর্ণ পদক্ষেপ সন্দেহ নেই। কিন্তু এসব 'চালাকি' সরকারের শক্তির নিদর্শন নয়, বরং তাদের নৈতিক পরাজয়ের লক্ষণ। এটা প্রমাণ করে যে, বৈজ্ঞানিক তথ্য-যুক্তির সামনে দাঁড়ানোর কোন তথ্য-যুক্তি সরকারের নেই; গণরায়ের সামনে দাঁড়ানোর নৈতিক সাহস তাদের নেই। সেজন্যই এই ভিত্তিফলক বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় স্বার্থ বিরোধী সুন্দরবন ধ্বংসের তৎপরতার একটি চিহ্ন হয়ে থাকবে। 'উন্নয়ন' নামের এই ধ্বংসের প্রকল্পকে বাংলাদেশ ও ভারতের বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেব আখ্যায়িত করলেও এটি কার্যত ভারতের সাথে বৈরিতা বৃদ্ধির একটি প্রকল্প। সরকার এই প্রকল্প নিয়ে অগ্রসর হবার মাধমে ভারতের সাথে বন্ধুত্বের পথ আরও সংকুচিত করেছেন। ভারতের আগ্রাসী নীতি এবং দুই দেশের কতিপয় গোষ্ঠীর মুনাফা আগ্রাসী তৎপরতার কাছে সরকার আত্মসমর্পণ করেছেন। সুন্দরবনকে ধ্বংস করার এই প্রকল্প কাজের আনুষ্ঠানিক ফলক উন্মোচনের দিন তাই বাংলাদেশ ভারতের সম্পর্কেরও একটি কলঙ্ক হয়ে থাকবে।

এর আগে গত ৩-৫ মার্চ ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি বাংলাদেশ সফর করেন। ঢাকায় প্রদত্ত বক্তব্যে তিনি সুন্দরবন রক্ষায় দুই দেশের যৌথ ভূমিকার আহ্বান জানিয়েছিলেন। আমরা স্বস্তি পেয়েছিলাম। কিন্তু ক্রমান্বয়ে দেখতে পাচ্ছি, দুই দেশের সরকার যৌথভাবে রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্পের মাধ্যমে বরং সুন্দরবন ধ্বংসের আয়োজন করছেন। আশার কথা এই যে, দুই দেশের জনগণের পক্ষ থেকেই এ বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ সংগঠিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে সুন্দরবন রক্ষার লক্ষ্যে তেল গ্যাস খনিজ সম্পদ বিদ্যুৎ ও বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির আহ্বানে লংমার্চ কর্মসূচিতে অসংখ্য মানুষ সাড়া দিয়েছেন।

দেশের শিল্প, কৃষি, ব্যবসা, শিক্ষা, চিকিৎসা, জীবনযাপন এবং সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য সম্ভবমতো কম দামে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ অত্যাবশ্যক। এর জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থাবলীর সুপারিশ আমরা বিভিন্ন করেছি। এসব সুপারিশের মূল কথা হলো জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের সম্পদের একশো ভাগ জনগণের মালিকানার রেখে তার পুরোটা বর্তমানে ও ভবিষ্যতে দেশের কাজে লাগানো, খনিজ সম্পদ রফতানি নিষিদ্ধ করা, নবায়নযোগ্য ও অ-নবায়নযোগ্য জ্বালানির সংমিশ্রণে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। দেশ ও জনগণ এতে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকট থেকে খুব দ্রুত মুক্ত হতে পারত। কিন্তু এভাবে অগ্রসর হলে বহুজাতিক কোম্পানি, দেশি কতিপয় ব্যবসায়ী ও কমিশনভোগীরা বিরাট লুটপাট থেকে বঞ্চিত হতো— সেটাই নীতিনির্ধারকদের জন্য সমস্যা।

সুন্দরবনের আঙিনায় রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে ভারতের সাথে যৌথভাবে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেজ্ঞরা দীর্ঘসময় ধরে সমীক্ষা করে এই প্রকল্পের ভয়াবহতা সম্পর্কে আগেই সতর্ক করেছেন। পরে অন্য বিশেষজ্ঞরাও প্রায় একইরকম বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞ-মত ও জনগণের বিরোধিতা উপেক্ষা করে, পরিবেশ অভিমত সমীক্ষা (ইআইএ) না করে, সরকার এলাকার মানুষের জমি দখল করেছে এবং তাদের উচ্ছেদ করেছে। প্রতিবাদকারীদের উপর পুলিশ ও সন্ত্রাসী দিয়ে হামলা চালানো হয়েছে বহুবার। জমি অধিগ্রহণ ও প্রাথমিক চুক্তি সম্পন্ন করবার পরেই ইআইএ রিপোর্ট সম্পন্ন করা হয়েছে।

গত ১২ এপ্রিল ইআইএ রিপোর্ট পর্যালোচনার জন্য বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় একটি পর্যালোচনা সভার আয়োজন করে। উক্ত সভায় বিশেষজ্ঞরা ইআইএ রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করে নতুন ইআইএ রিপোর্ট প্রণয়ন করার জন্য দাবি জানান। একই সভায় নতুন রিপোর্ট না হওয়া পর্যন্ত এই প্রকল্পের কাজ বন্ধ রাখারও দাবি জানানো হয়। ইআইএ রিপোর্ট এভাবে প্রত্যাখ্যাত হবার পরেও গত ২০ এপ্রিল রামপাল বিদ্যুৎ পক্ষে নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারত যে চুক্তি স্বাক্ষর করে তাতে দুই দেশের সরকার যৌথভাবে আন্তর্জাতিক বিধি লঙ্ঘন করে পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন, প্রাণ-বৈচিত্র্যের অসাধারণ আধার এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষের সব চাইতে শক্তিশালী প্রাকৃতিক রক্ষা-বর্ম সুন্দরবন ধ্বংস করার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করেছে। উপরন্তু এই চুক্তিতে ভারতীয় কোম্পানির উচ্চ মুনাফা নিশ্চিত করার জন্য কর মকুব, বিদ্যুতের দাম অনির্ধারিত রাখা হয়েছে, আর সব ধরনের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে।

কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র মারাত্মক পরিবেশ দূষণ ঘটায় বলে সাধারণত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংরক্ষিত বনভূমি ও বসতির ১৫ থেকে ২৫ কিমি-র মধ্যে কয়লা বিদ্যুৎ নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয় না। অথচ, ভারতীয় কোম্পানি

বাংলাদেশে সুন্দরবনের ৯-১৪ কিমির মধ্যে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মাণ করতে যাচ্ছে। বাফার জোন বিবেচনা করলে এই দূরত্ব ৪ কিমি। অথচ ভারতেরই 'ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশান অ্যাক্ট ১৯৭২' অনুযায়ী, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১৫ কিমি ব্যসার্ধের মধ্যে, এবং ভারতের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় প্রণীত পরিবেশ সমীক্ষা বা ইআইএ গাইড লাইন ম্যানুয়াল ২০১০ অনুযায়ী, কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ২৫ কিমি-র মধ্যে কোন বাঘ/হাতি সংরক্ষণ অঞ্চল, জৈব বৈচিত্র্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বনাঞ্চল, জাতীয় উদ্যান, বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য অথবা অন্য কোনও সংরক্ষিত বনাঞ্চল থাকা অনুমোদন করা হয় না। ভারতীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের 'তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত গাইডলাইন, ১৯৮৭, অনুসারেও কোন সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ২৫ কিমি-র মধ্যে কোন কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ স্থাপন করা যায় না। এজন্য গত কয়েক বছরে ভারতের কর্নাটক, মধ্যপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে তিনটি বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিল হয়েছে। অর্থাৎ ভারতীয় কোম্পানি এনটিপিসি-কে বাংলাদেশে সুন্দরবনের যত কাছে পরিবেশ ধ্বংসকারী কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করতে দেওয়া হচ্ছে, তার নিজ দেশ ভারতে হলে সেখানকার আইন অনুযায়ী তা তারা করতে পারত না!

ভারতীয় কোম্পানির মাত্রাতিরিক্ত মুনাফা নিশ্চিত করতে ও দেশি কিছু সুবিধাভোগীর স্বার্থে প্রণীত এই ধ্বংসাত্মক প্রকল্পের সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় বলা হচ্ছে যে, এই প্রকল্পে সুপারক্রিটিকাল টেকনোলজি ব্যবহার করা হবে, সেজন্য সুন্দরবনের কোন ক্ষতি হবে না। আমাদের প্রশ্ন : প্রথমত, এই প্রযুক্তিতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শতকরা ১০ ভাগ ক্ষতি কম হয় ঠিকই, কিন্তু তাতে সুন্দরবনের ধ্বংসের সামগ্রিক ক্ষতি কীভাবে কমবে? দ্বিতীয়ত, এই প্রযুক্তি যদি সুন্দরবন ধ্বংস ঠেকানোর মতো এত নিশ্চিত প্রযুক্তি হয় তাহলে ভারতীয় কোম্পানিটি কেন ভারতে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে সকল ক্ষতি দূরীভূত করে না? কেন গত তিন বছরে তাদের তিনটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাতিল হয়?

সরকার যখন একদিকে সংকটের সমাধানের কথা বলে সুন্দরবন-ধ্বংসী তৎপরতায় লিপ্ত, ঠিক সেসময়ই বঙ্গোপসাগরের বিশাল সম্ভাব্য মজুদের ওপর বাংলাদেশের কর্তৃত্ব বিনাশ করে এই সম্পদের বিশাল সম্ভাবনা নষ্ট করছে। গ্যাস সংকট চলছে, কনোকো ফিলিপস-এর সাথে রফতানিমুখী চুক্তিও বলবৎ আছে। এর মধ্যে পুঁজির অভাবের কথা বলে অগভীর সমুদ্রের তিনটি পয়েন্ট দুটি মার্কিন ও ভারতীয় কোম্পানিকে দেওয়া হয়েছে। অথচ তারা পাঁচ বছরে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করবে তার সমপরিমাণ 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিলে' অলস পড়ে আছে।

সম্প্রতি সরকার বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানির দাবি অনুযায়ী পিএসসি-২০১২ সংশোধন করে আরও বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। এই সংশোধনীতে কোম্পানিগুলোর সুবিধা এত বেশি বাড়নো হয়েছে যে, এরপর থেকে বাংলাদেশকে নিজের গ্যাস আমদানি করা আন্তর্জাতিক দামের বেশি খরচে কিনতে হবে। উপরন্তু সম্পূর্ণ জিম্মি থাকতে হবে এইসব কোম্পানির হাতে। তাদের কাছ থেকে গ্যাস কেনার জন্য গ্যাসের দাম বাড়ানো হচ্ছে শতকরা প্রায় ৫০ থেকে ৭০ ভাগ। তাছাড়া যে কোন দামে তৃতীয় পক্ষের কাছে গ্যাস বিক্রির সুবিধা দিয়ে পুরো জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতকে অসম্ভব ব্যয়বহুল করে ফেলার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এরপরও বিদেশি কোম্পানির কর মকুব করা হচ্ছে। গ্যাসের উপর তাদের কর্তৃত্বের অনুপাতও বাড়ানো হচ্ছে। কস্ট রিকভারি হিসেবে তাদের মালিকানা শতকরা ৫৫ ভাগের বদলে করা হচ্ছে ৭০ ভাগ। জ্বালানি নিরাপত্তা ও জ্বালানি সংকট সমাধানের যে শক্তিশালী সম্ভাবনা বাংলাদেশে আছে, পিএসসি ২০১২ অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর হতে থাকলে তা সম্পূর্ণ নিঃশেষ হবে। সম্পদ পরিণত হবে অভিশাপে।

বিশেষজ্ঞরা তো বটেই, এমনকি পিডিবির মধ্য থেকেও বলা হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় বিদ্যুৎ পয়েন্ট মেরামত করলে খুব কম খরচে প্রায় ২ হাজার মেগাওয়াট বাড়তি বিদ্যুৎ পাওয়া যেত। সেটা না করে ৮ গুণ বেশি দামে তার থেকে কম বিদ্যুৎ পাবার জন্য রেন্টাল ও কুইক রেন্টালের ফাঁদে দেশকে ফেলে ভয়াবহ ঋণের বোঝা তৈরি করেছে সরকার। নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিশাল সম্ভাবনা ও ক্ষুদ্র কিছু উদ্যোগের মধ্যে আটকে রেখে বিদেশি কোম্পানিগুলির ওপর পূর্ণ নির্ভরশীল হতে বিপজ্জনকভাবে পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে, সুন্দরবন ধ্বংসের আয়োজন চলছে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট নিরসনের নামে, দেশি বিদেশি এই লুটেরা গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে, সরকার বারবার দেশের জন্য সর্বনাশা পথ গ্রহণ করছে। এই কাজে বৃহৎ দল ও তাদের সরকারগুলোর মধ্যে আমরা নীতিগত পার্থক্য দেখি না। জনস্বার্থ বিবেচনায় না নিয়ে কিছু দেশি বিদেশি গোষ্ঠীর স্বার্থে পরিচালিত হওয়ায়, গ্যাস ও বিদ্যুৎ ও সংকট সমাধানের নামে যেসব তৎপরতা চলছে তা দেশের জন্য একের পর বিপদ তৈরি করছে। সুন্দরবন-কৃষিজমি-শহর ধ্বংসী রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মাটি, জল, মানুষ, বিনাশী ফুলবাড়ী, বড়কুকুরিয়ার উন্মুক্ত খনির চক্রান্ত অব্যাহত রাখা, বঙ্গোপসাগরের গ্যাস উত্তলনের একতরফা সুবিধা দিয়ে বিদেশি কোম্পানির কাছে ইজারা, কুইক রেন্টালের নামে ১৪ থেকে ১৭ টাকা কিংবা তারও বেশি দরে বিদ্যুৎ ক্রয়, কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি না করে, জনবল তৈরি না করে, প্রয়োজনীয় সমীক্ষা না করে বিদেশি কোম্পানি নির্ভর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্যোগ ইত্যাদি প্রকৃতপক্ষে

জনস্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে কিছু গোষ্ঠীর মুনাফা ও লুটপাটের আয়োজন ছাড়া আর কিছু নয়।

আমরা বারবার বলছি, বিদ্যুৎ উৎপাদনের অনেক বিকল্প আছে, সুন্দরবনের কোন বিকল্প নেই। সুন্দরবন না থাকলে একেকটি প্রাকৃতিক দুর্যোগে কমপক্ষে ৩ থেকে ৫ লক্ষ মানুষ জীবন হারাবেন। সুন্দরবন ধ্বংস মানে অরক্ষিত বাংলাদেশ। এই পথ থেকে সরকারকে অবশ্যই সরে আসতে হবে। রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প সহ সুন্দরবনধ্বংসী সব তৎপরতা বন্ধ করে গ্যাস বিদ্যুৎ সংকট সমাধানে জাতীয় কমিটির ৭ দফার ভিত্তিতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হলে টেকসই বিদ্যুৎ যোগানও সুলভ ও নিশ্চিত হবে।

প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের কোন সরকারই সুন্দরবন ধ্বংস করে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র করতে পারবে না, কেননা সুন্দরবন রক্ষায় এখন জাতীয় জাগরণ তৈরি হয়েছে। ভারতের কোন সরকার সুন্দরবন ধ্বংসের প্রকল্প গায়ের জোরে বাংলাদেশের উপর চাপাতে পারবে না, কেনা ভারতের সজাগ মানুষেরাও আমাদের এই আন্দোলনে যোগ দিচ্ছেন। সেখানেও এই ধ্বংসাত্মক প্রকল্প বাতিলের দাবিতে ইতিমধ্যে এনটিপিসি-কে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে, স্বাক্ষর সংগ্রহ চলছে, কলকাতা থেকে সুন্দরবন অভিমুখে লংমার্চেরও প্রস্তুতি চলছে। বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তের সজাগ মানুষেরাও সুন্দরবন ধ্বংসের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বিজ্ঞানী, শিল্পী, রাজনৈতিক কর্মীরা উদ্বেগ নিয়ে যোগাযোগ করছেন। কেননা সুন্দরবন শুধু বাংলাদেশের নয়, বিশ্বেরও সম্পদ।

টুকরো খবর

শ্রমচিত্র : বিশ্ব

২০০০ সালে, শতাব্দীর শুরুতে, বিশ্বে কর্মহীনের সংখ্যা ছিল ১৭.৫ কোটি। ২০১২ সালে বিশ্বে কর্মহীনের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৯.৭ কোটি। ২০১১ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে, মাত্র এক বছরে বিশ্বে কর্মহীনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪২ লক্ষ। পরের বছর, ২০১৩ সালে, বিশ্বে কর্মহীনের আনুমানিক সংখ্যাবৃদ্ধি আরো ৫১ লক্ষ।

এর মধ্যে উন্নত দেশগুলিতে কর্মহীন মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি ১০ লক্ষ। অন্যত্র ৩০ লক্ষ। বেকারি সবথেকে বেশি বেড়েছে পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকার নিম্ন-সাহারা দেশগুলিতে। ২০১২ সালে বিশ্বে কর্ম সঙ্কোচন বা কাজ থেকে ছাঁটাইয়ের সংখ্যা ৩.৯ কোটি।

বিশ্বে যুব সম্প্রদায়ের (১৫-২৪ বছর বয়স) মধ্যে কর্মহীনের সংখ্যা ৭.৪ কোটি। উন্নত দেশগুলিতে কর্মহীন যুবসম্প্রদায়ের ৩৫ শতাংশের বছরের অর্ধেক সময় কোন কাজ জোটেনা।

৩৯.৭ কোটি শ্রমিক চরম দুর্দশার মধ্যে বাস করে। ৪৭.২ কোটি শ্রমিক জীবনধারণের প্রাথমিক উপাদানগুলি নিয়মিত সংগ্রহ করতে পারেনা।

১৯৯১ সালে সমগ্র বিশ্বে কর্মরতদের গরিষ্ঠাংশ ছিল অত্যন্ত গরিব। তাদের ৪৫ শতাংশের দৈনিক আয় ছিল ১.২৫ ডলারের কম। উচ্চ আয়ের কর্মী (দৈনিক আয় ১৩ ডলারের বেশি) ছিল মাত্র ৫.৩ শতাংশ। বর্তমানে কর্ম সঙ্কোচনের সাথে সাথে নিম্ন আয়ের কর্মী সংখ্যা কমছে। যেটুকু কর্মসংস্থান হচ্ছে, তাতে উচ্চ আয়ের কর্মীদেরই আধিক্য। সমাজের নীচের তলায় কর্মসংস্থানের সুযোগ কমছে।

শ্রমচিত্র: ভারত

১৯৯৮-৯৯ এবং ২০০৮-০৯ সালে ভারতে পণ্যোৎপাদনে নীট মূল্য যুক্ত (এনভিএ) হয়েছিল যথাক্রমে ১৪৫৪৬১.০৫ কোটি টাকা এবং ৫২৭৭৬৫.৫৮ কোটি টাকা। তার মধ্যে মজুরির অংশ ছিল যথাক্রমে ২৬৫২৮.৯৫ ও ৫৯৭৭১.৮৪কোটি টাকা। শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির হার ৩.৭ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছিল ৭.৩ শতাংশ। শ্রমিক পিছু মূল্য যুক্ত হয়েছিল যথাক্রমে ২.২৯ এবং ৬.০১ লক্ষ টাকা। অথচ ১৯৯৮-৯৯ সালে নীট মূল্যে মজুরির অংশ ছিল মাত্র ১৮ শতাংশ, ১০ বছর পরে তা আরো কমে দাঁড়ায় ১১ শতাংশে। অর্থাৎ ১০ বছরে ভারতের অর্থনীতিতে ২৬২.৮২ শতাংশ বাড়তি মূল্য যুক্ত হলেও, শ্রমের মূল্য ৭ শতাংশ কমে গিয়েছিল।

সূত্র- FORCES OF LABOUR, Subodh Varma, Times of India, 6 November 2011

শ্রমের উপর আক্রমণ বাড়ছে

১৯৯১ সাল থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত, ১৬ বছরে, দেশে ধর্মঘটের সংখ্যা ৯৭৬৮ এবং লক-আউটের ঘটনা ৬২৩৯। কিন্তু ধর্মঘটে শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছে মাত্র ৩৫ শতাংশ (১৪.৬ কোটি শ্রমদিবস), লক-আউটে ৬৫ শতাংশ (২৬.৬ কোটি শ্রমদিবস)। ১৯৯১ সালের পর, ধর্মঘট ও লক-আউট, সংখ্যাগতভাবে দুটোই হ্রাস পেলেও, লক-আউটের ব্যাপ্তি বা সময়কাল অনেক বেশি। ২০০৩ সাল থেকে লক-আউটের সংখ্যা ও ব্যাপ্তি তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রবন্ধ

মুক্ত বাজার, গুজরাটে 'উন্নয়ন' ও মোদী উত্থান

মুনমুন

২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনের ছবিটা মনে পড়ছিল। কংগ্রেস সরকারের ঝুলিতে তখনও ছিল একাধিক দুর্নীতি, কেলেঙ্কারি। তৎসত্ত্বেও বিকল্পহীনতা, আঞ্চলিক দলগুলির জনপ্রিয়তা কমে যাওয়ার প্রভাবে কংগ্রেসের ভোটব্যাংক ছিল চোখে পড়ার মত। বাজপেয়ী সরকারের পতনের পর কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ জোটের সরকার গঠন। অপরদিকে প্রবীণ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণীর প্রচার, প্রসার, দ্বিতীয় রথযাত্রার দামামা, কোনকিছুই যখন সোনিয়া-মনমোহনের 'আম-আদমি' টোপের মাঝে ধোপে টিকছে না, আবার গোদের ওপর বিষফোড়ার মত পেকে উঠছে মোহন ভগবত-রাজনাথ-আডবানি-জেটলি কোন্দল। গুজরাট মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তখন কোথায়! জাতীয় রাজনীতিতে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তখন নীতিশের জয়জয়কার। বিজেপি দলটির এরূপ সংকটময় অবস্থা থেকে ২০১৪-র নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মোদীর হঠাৎ আবির্ভাব ও উত্থান, নেহাতই কাকতালীয় মনে হয় না কি!

রাহুল গান্ধী বনাম মোদী তরজায় বারে বারে উঠে আসছে গুজরাট রাজ্যের উন্নয়ন মডেলের কথা। মোদীকে প্রধানমন্ত্রী পদে দেখতে চাওয়ার তালিকায় নাম লিখিয়েছে সিঙ্গুর প্রত্যাখ্যাত গুজরাট আশ্রিত ন্যানো-র রতন টাটা, রিলায়েন্সের মুকেশ আম্বানি, অনিল আম্বানি, মাহিন্দ্র গ্রুপের কেশুভাই মাহিন্দ্রা, স্টারলাইটের অনিল আগরওয়াল। অভূতপূর্বভাবেই গোটা বণিকসভা যখন মোদীর প্রশ্নে এক, তখন কর্পোরেট প্রচার মাধ্যমও নতুন উদ্যমে তাদের সর্বপ্রকার প্রতিভা নিয়ে 'লৌহপুরুষ'-কে 'বিকাশপুরুষ' করতে ময়দানে নেমে পড়েছে। লতা মঙ্গেশকরও নাকি 'মোদী ভাই'-কেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান। অতএব, খেলা আর মোহন ভগবতের একার হাতে নেই। নয়া উদারনৈতিক উন্নয়ন মডেলের 'সফল' রূপকার মোদীও এবার তাই সরাসরি মুক্ত বাজারের প্রার্থী।

গুজরাট রাজ্য— দুই অঙ্কের বৃদ্ধির নেপথ্যে

একথা ঠিক যে, গুজরাট রাজ্যের মোট আয় (Gross State Domestic Product বা GSDP) বৃদ্ধির হার ১৯৮১-৯০-এ ছিল ৫.৫ শতাংশ, যা ১৯৯১-২০০০-এ হয় ৮ শতাংশ, এবং ২০০১-১০-এ ১০.২ শতাংশ। কিন্তু জিডিপি-র সূচক বৃদ্ধি যে সবসময় মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নতিকে আদৌ নির্দেশ করে না, সে বিতর্ক আজ নানা প্রান্ত থেকেই উঠে এসেছে। আজকের গুজরাটকে খতিয়ে দেখলে, তারই প্রমাণ স্পষ্ট হবে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিশুর পুষ্টি থেকে শুরু করে পানীয় জল, শৌচালয়ের সুযোগ থেকে লিঙ্গবৈষম্য, অনগ্রসর মানুষদের জীবনযাত্রার মান, সবকিছুর নিরিখেই ভারতবর্ষের বাকি রাজ্যগুলোর তুলনায় গুজরাটের অবস্থান উল্লেখযোগ্যভাবেই খারাপ। আর্থিক বৃদ্ধি সত্ত্বেও ১৯৯০-৯৫ থেকে ২০০৫-১০ শিক্ষাখাতে রাজ্য বাজেটে বরাদ্দ ৪.২৫ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ০.৭৭ শতাংশ। ১৯৯০ থেকে ২০১০-এর মধ্যে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়বরাদ্দ সারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে কম। ২০১২-র UNESCO রিপোর্ট অনুযায়ী পাঁচ বছরের নিচের ৫০ শতাংশ শিশু অপুষ্টির শিকার। তপশিলি জাতি-উপজাতিদের মধ্যে এর পরিমাণ যথাক্রমে ৫৪.৫ শতাংশ ও ৬০.৯ শতাংশ। ৬৭ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারে কোন শৌচালয় নেই। প্রতি ১০০০ পুরুষে নারীর সংখ্যা ৯১৮।

২০১১-র ক্যাগ রিপোর্টে পরিষ্কার যে সে রাজ্যে গত তিন বছরে সরকারি বিনিয়োগের মাত্র ০.২৫ শতাংশ কোষাগারে ফেরত এসেছে, অথচ ২০০৮-১১ সময়কালে ঋণ বাবদ সরকারকে সুদ মেটাতে হয়েছে ৭.৬৭ শতাংশ। সর্দার সরোবর নিগম লিমিটেড-এর রিপোর্ট বলছে, ২০০৬ সালে এই প্রকল্পের মোট খরচের ৫৫ শতাংশ চলে যাচ্ছে ঋণ বাবদ সুদ মেটাতে। ক্যাগ রিপোর্টে ২০১০-১২ আর্থিক বর্ষে রাজ্যের আর্থিক ঘাটতি দেখা যাচ্ছে ১১,০২৭ কোটি টাকা। সম্প্রতি প্রকাশিত ২০১৩ ক্যাগ রিপোর্ট বলছে, গত কয়েক বছরে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প রূপায়ণে রাজ্য সরকারের উল্লেখযোগ্য ব্যর্থতা দেখা গেছে। এর মধ্যে রয়েছে, গুজরাটের উপকূলবর্তী অঞ্চলের নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ, মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রকল্প, সরকারি হাসপাতালগুলোর পরিবেশ-পরিচ্ছন্নতা প্রকল্প, ICDS-এর শিশুদের শিক্ষা স্বাস্থ্য, পুষ্টি সংক্রান্ত প্রকল্পগুলির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

গুজরাট রাজ্যের উন্নয়নের আষাঢ়ে গল্পে যে বিষয়গুলো বারেবারে উল্লেখ করা হচ্ছে, তার মধ্যে অন্যতম কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগের সু-বন্দোবস্তের কথা। দেখা যাক মিথের আড়ালে আসল ছবিটা কীরকম।

কর্মসংস্থান

গুজরাট সরকার দাবি করছে যে তারা বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থান করতে সফল। রাজ্য সরকারের কর্মসংস্থান প্রকল্প বলতে রয়েছে 'রোজগার মেলা'। এইরকম ৪৮৯টি মেলায়, বলা হয়েছে, ৬৫,০০০ যুবকযুবতীর চাকরি হয়েছে। ২০১২-র এপ্রিলে করা একটি আরটিআই থেকে জানা যাচ্ছে, ২৩টি জেলায় হিসেব অনুযায়ী মোট ৫১,৫৮৭টি চাকরি হয়েছে, যার মধ্যে ১১,৪৭২ জন নিছকই শিক্ষানবিশ, অর্থাৎ যাদের ভবিষ্যৎ কাজের কোন

নিশ্চয়তা নেই। অর্থাৎ ঠিকঠাক কাজ পেয়েছে ৪০,৪১৫ জন। অবশ্য সরকার নাম দেখাতে পেরেছে মাত্র ৩২,৩৭২ জনের। আরটিআই করেছিল যে সংগঠনটি তাদের আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু পর্যবেক্ষণ হল— কেউ কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পায়নি, কেবল এমপ্লয়মেন্ট লেটার বলে একটা কাগজ পেয়েছে, যার আইনি নিরাপত্তা নিশ্চিত নয়। পাশাপাশি প্রতিটি মেলা করতে সরকারি খরচ হয়েছে ১,৮৭,৭০,০০০ টাকা, যার মধ্যে মন্ত্রীদের অংশগ্রহণের খরচ ধরা হয়নি। আমেদাবাদে কাজ হয়েছে ৪,৩৭০ জনের, প্রতিটিই শিক্ষানবিশ হিসেবে, অর্থাৎ সরকারি আইন অনুযায়ী কোন আইনি সুবিধা তো তারা পাবেই না, প্রথম বছরে মাসিক অনুদান পাবে ১,৪৯০ টাকা, দ্বিতীয় বছরে ১৭০০ টাকা ও তৃতীয় বছরে পাবে ১৯৭০ টাকা। বাকি যাদের কাজ হয়েছে, বেশিরভাগই অদক্ষ শ্রমিকের ঠিকা কাজ। আনন্দ জেলায় ৬২১জন গ্র্যাজুয়েট/এমএ/এমএ-বিএড ইত্যাদিদের কাজ হয়েছে স্কুল কো-অর্ডিনেটর হিসেবে। এদের মাসিক মাইনের প্রতিশ্রুতি ছিল ৪,৫০০-৫০০০ টাকা, তবে তারা পাচ্ছে ৩,১০০-৩,৫০০ টাকা।

সরকারের পদক্ষেপগুলো কতটা প্রচারমূলক আর কতটা উন্নয়নমূলক, তা বুঝতে ওপরের তথ্যগুলো সাহায্য করবে। এরকম উদাহরণ আরো আছে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী গত দুই দশকে গুজরাটে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার মাত্র ১.৭ শতাংশ। আর নির্মাণ বা পরিষেবার মতো যে ক্ষেত্রগুলিতে বৃদ্ধি হয়েছে, তা মূলত ঠিকা কাজে। স্থায়ী ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি প্রায় শূন্য। মোদীর মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন গুজরাটে ৯,৮২৯ জন শ্রমিক, ৫,৪৪৭ জন কৃষক, ৯১৯ জন খেতমজুর আত্মহত্যা করেছে। এখানেই জানিয়ে রাখি যে গুজরাট রাজ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার গৃহীত মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ রোজগার নিশ্চয়তা যোজনা (MGNREGA) রূপায়ণের হাল সবচেয়ে খারাপ।

বিনিয়োগ ও শিল্পায়ন

মোদীর রাজ্যের প্রচারের আরেক অস্ত্র বিনিয়োগের বন্যা। প্রতি বছর মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আয়োজিত 'Vibrant Gujrat summit' হল বিনিয়োগকারীদের এক মহাসম্মেলন। এখানে দেশ-বিদেশের পুঁজিপতিদের সামনে গুজরাট সরকার একের পর এক পুঁজি-বান্ধব, রাজ্যের মানুষের স্বার্থ-বিরোধী প্যাকেজ ঘোষণা করে। কোটি কোটি টাকার শিল্পের মউ স্বাক্ষরিত হয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে শিল্পপতিদের। কর্পোরেট মিডিয়া জয়ধ্বনি তোলে মোদী-সরকারের। এর মধ্যে সমস্ত শিল্পচুক্তি বাস্তবায়িত হবে এমন ভাবার কোন কারণ নেই। বেশিরভাগ চুক্তিই প্রচারমূলক, যা মোদী, শিল্পপতি ও কর্পোরেট দুনিয়া প্রত্যেকেরই স্বার্থের অনুকূল।

এটা ঠিক যে ভারতবর্ষে বেসরকারি পুঁজির পছন্দের রাজ্যগুলির মধ্যে ওড়িশা, ছত্তিশগড়ের পরই গুজরাটের স্থান। কিন্তু কেন? গুজরাট সরকারের শিল্পনীতির মধ্যেই এই প্রশ্নের আসল উত্তর রয়েছে। সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে, মিডিয়ার কল্যাণে প্রকাশিত হয়ে যাওয়া, সিঙ্গুর থেকে উৎখাত হওয়া টাটা-দের ন্যানো প্রকল্পকে গুজরাট সরকারের দেওয়া সুবিধেগুলোর কথা বলি। এগুলোর মধ্যে রয়েছে— ০.১ শতাংশ সুদে ৯,৫৭০ কোটি টাকার (গুজরাটের বার্ষিক বাজেটের ২৫ শতাংশ) ঋণ, যা টাটারা ২০ বছর ধরে শোধ দেবে। জমির দাম টাটারা ৮টি কিস্তিতে দেবে। জমির রেজিস্ট্রেশন ফী, ট্রান্সফার ফী, বিদ্যুৎ সারচার্জ মকুব। এছাড়াও দেওয়া হবে একটা চার লেনের রাস্তা, পাইপলাইনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ ও আমেদাবাদে আবাসন বানানোর জন্য ১০০ একর জমি বিনামূল্যে। অর্থাৎ যে কোন মূল্যে বিনিয়োগ আকর্ষণই গুজরাট সরকারের শিল্পনীতির এক নম্বর কথা। শিল্পপতিদের বিশেষ বিশেষ সুবিধা দেওয়ার গালভরা নামগুলো হলো— ইনভেস্টর সাপোর্ট সিস্টেম (ISS), পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (PPP) মডেল, স্পেশ্যাল ইকনমিক জোন (SEZ), স্পেশাল ইনভেস্টমেন্ট রিজিয়ন (SIR)। এছাড়া গুজরাট সরকারের শিল্পনীতির যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সামনে এসেছে তা হলো— (১) কৃষিজমির অবাধ লুণ্ঠন, (২) শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে ভয়ানক আক্রমণ, ও (৩) পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের ভয়াবহ ধ্বংসসাধন।

এসার গ্রুপ, আদানি গ্রুপ থেকে শুরু করে ছোট বড় বাণিজ্য-গোষ্ঠীকে সরকারের বিরাট পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি করে বাজার মূল্যের থেকে বহু কম মূল্যে, নামমাত্র চুক্তিতে বিরাট পরিমাণ কৃষিজমি দেওয়ার উদাহরণ গুজরাটে ভুরিভুরি। ভাবনগর জেলার জাসপার ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ছিল আম ও বাগিচা ফসলের জন্য বিখ্যাত। এখানকার মানুষও তাই ছিল সচ্ছল। কিন্তু 'মিথি ভিরদি নিউক্লিয়ার এনার্জি প্রজেক্ট'-এর জন্য এই অঞ্চল পছন্দ করল প্রকল্পের রূপকাররা। ২৪টি গ্রামের ১৫,০০০ মানুষকে সরাসরি উৎখাত করা হল, পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল আরো ১৫২টি গ্রামের ১ লক্ষ ৫০ হাজার মানুষ। প্রকল্পের জনশুনানির দিন উপস্থিত কয়েক লক্ষ মানুষের বিরোধিতার কথা শোনাই হলো না।

গুজরাট রাজ্যে শ্রমিকদের প্রায় কোন অধিকারই নেই। বেশিরভাগ শ্রমিকই অসংগঠিত ক্ষেত্রে বা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে চুক্তিভিত্তিক ঠিকা কাজে যুক্ত। সেখানে শ্রম আইনের কোন বালাই নেই, দিনে কাজ করতে হয় গড়ে ১০-১২ ঘণ্টা, বেশিরভাগ কারখানায় 'নো ওয়ার্ক নো পে', সাপ্তাহিক ছুটির ব্যবস্থা নেই। সবচেয়ে বিপজ্জনক কাজগুলি আবার করে পরিযায়ী শ্রমিকেরা। গত বছর নারোডা শিল্পাতালুকে রিলায়েন্স টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির অত্যাধুনিক ড্রেস মেটেরিয়াল তৈরির বেশ

লাভজনক কারখানায় শ্রমিকরা ১৫ বছর ধরে মাইনে না বাড়ার প্রতিবাদে সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করে। পুলিশ দিয়ে নির্মমভাবে সেই আন্দোলন দমন করে গুজরাট সরকার।

গুজরাট রাজ্যের শ্রমবাহিনীর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান শিশু শ্রমিক। হিরে আর বস্ত্রবয়ন শিল্পে শিশুশ্রমিকদের সংখ্যা বেশ বেশি। সুরাটে রত্ন শিল্পে নিযুক্ত ২৫ শতাংশ শ্রমিকই শিশু। আমেদাবাদে 'দলিত হক্ রক্ষক মঞ্চ'-র প্রকাশিত একটি রিপোর্টে দেখানো হয়, গুজরাতে ৮ লক্ষ শিশু শ্রমিকদের মধ্যে বেশিরভাগই দলিত ও আদিবাসী।

গুজরাট রাজ্যে শিল্পায়নের প্রকোপে পরিবেশ মারাত্মকভাবে আক্রান্ত। পরিবেশ মন্ত্রক প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ভারতের ৮৮টি সবচেয়ে দূষিত শিল্পাঞ্চলগুলির ৮টি গুজরাটে। গুজরাটের সবকটি নথিভুক্ত রাসায়নিক কারখানাই কোন না কোন কারণে বিপজ্জনক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। গোটা রাজ্যের ৪৯৭টি কারখানা বিপজ্জনকভাবে দুর্ঘটনা-প্রবণ। ভাপি, আঙ্কেলেশ্বর সহ বেশ কিছু শিল্পাঞ্চলের আবহাওয়া দূষিত। রাসায়নিক, পেট্রো-রাসায়নিক কারখানা সহ জায়গায় জায়গায় শিল্পায়ন হয়েছে পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদের বিশেষ ক্ষতি করে। গুজরাটের বিরাট উপকূলবর্তী অঞ্চলের ম্যানগ্রোভ অরণ্যের ৩৫ শতাংশ ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে, শিল্পায়নের চাহিদায়। গুজরাটের বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ নদী দূষণে আক্রান্ত। অথচ উল্টোদিকে সম্ভাবনাময় প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধে কোন ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি রাজ্য সরকারকে।

উচ্ছেদের উন্নয়ন

নয়া উদারনৈতিক 'উন্নয়ন' মডেলের একটি পরিচিত বৈশিষ্ট্য উচ্ছেদ। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-নোনাডাঙ্গা খ্যাত পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে এ প্রসঙ্গ নতুন নয়। কলিঙ্গনগর-পস্কো-নিয়মগিরি-কোদানকোলাম সহ বহু জায়গায়, গোটা ভারতবর্ষ জুড়েই চলছে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষের সংগ্রাম। মোদীর গুজরাট যেহেতু উন্নয়ন ও শিল্পায়নে সফলতন, উচ্ছেদের বাস্তব সেখানে আরো নির্মম। অসংখ্য উচ্ছেদের কাহিনী শুনতে পাঠকের ক্লান্তি বাড়তে পারে, কিন্তু মানুষকে তার বেঁচে থাকার উপায় থেকে বিচ্ছিন্ন করে পুঁজির সঞ্চয়নের পথকে আরো আরো সুগম করে তোলার এই আদিম প্রক্রিয়াটির কোন ক্লান্তি নেই। বিগত ২৫০ বছরের পুঁজিবাদের ইতিহাস দাঁড়িয়ে আছে এই নির্মম ভিত্তির ওপর। মোদীর রাজ্যে ২১ হাজার কৃষক তাদের জমির থেকে বঞ্চিত হলেও আজ পর্যন্ত তারা কোন ক্ষতিপূরণ পায়নি।

মহুয়ার নিরমা *সেজ* প্রকল্পকে গুজরাট সরকার ২৬৮ হেক্টর কৃষি জমি দেয়। তার সাথে ভাবনগর জেলার উপকূল অঞ্চলের ৩০০০ হেক্টর জমি খননের অনুমতি দেয়। এর ফলে ১,৫০,০০০ মানুষ তাদের জীবনজীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়। বদলে কর্মসংস্থান হয় ৪১৬ জনের। গুজরাট হল ডেয়ারি শিল্পে খুব উন্নত একটি জায়গা। এখানকার বিস্তীর্ণ চারণভূমি (স্থানীয় ভাষায় গৌচর) এর অন্যতম কারণ। কিন্তু গুজরাট সরকার স্থানীয় মানুষ, গ্রাম সভা, পঞ্চায়েতকর্মীদের বক্তব্যের তোয়াক্কা না করে এই গৌচর অধিগ্রহণ করেছে। আমেদাবাদেই ৯৫ হেক্টর গৌচরকে ওয়েস্টল্যান্ড দেখিয়ে অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

মিথি ভিরদি ৬০০০ মেগাওয়াট পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিরুদ্ধে এখনো সংগ্রাম করছে। এ বছর ৫ মার্চ-এর জনশুনানির দিন ৬৫০০০ গ্রামবাসী, পঞ্চায়েত কর্মী, অন্যান্য সংগঠন উপস্থিত থেকে তাদের প্রতিবাদ জানিয়েছে। পরিবেশ কর্মী ও অন্যান্য সমাজকর্মীদের তোলা প্রশ্নে দেখানো হয়েছে কিভাবে উপকূল অঞ্চলের নিয়মের তোয়াক্কা না করে রাজ্য সরকার প্রকল্পের অনুমোদন করেছে। প্রকল্পের জন্য ৮১ হেক্টর বনভূমি সহ অন্যান্য জমি, গ্রাম ধ্বংস করে দেওয়া হবে।

সর্দার সরোবর বাঁধ পার্শ্ববর্তী গোরুড়েশ্বর বাঁধ তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেছে প্রয়োজনীয় পরিবেশগত ছাড়পত্র ছাড়াই। এই প্রকল্পে উচ্ছেদ হবে ৭০টি গ্রামের মানুষ। ১৬টি গ্রাম ইতিমধ্যেই কেভাদিয়া এরিয়া ডেভেলমেন্ট অথরিটি অন্তর্ভুক্ত। বাকি ৫৪টি গ্রামের মানুষ জোট বেঁধেছে 'জান দেঙ্গে মগর জমিন নেহি দেঙ্গে'-র স্লোগানে। গুজরাট সরকার তাদের রীতিমত শাসাচ্ছে জমি ছেড়ে দেওয়ার জন্য। এই প্রকল্পের কারণে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মৎস্যজীবী মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, জীববৈচিত্র্য সম্পূর্ণ ধ্বংস হবে। কিন্তু তাদের প্রতিবাদে ন্যূনতম কর্ণপাত না করে সম্প্রতি মোদী ঘোষণা করেছে সর্দার সরোবরের কাছে ২,৫০০ কোটি টাকা খরচে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের একটি মূর্তি বানানো হবে, যা হবে আমেরিকার স্ট্যাচু অফ লিবার্টি-র থেকেও উঁচু। এতে নাকি কেভাদিয়া অঞ্চলে ট্যুরিজম্ উন্নত হবে।

গোধরা-কুখ্যাতি বনাম 'উন্নয়ন'-এর কাণ্ডারী

গুজরাট রাজ্যের ৯ শতাংশ মুসলিম, মোদী ও তার দলের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কারণেই দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক, তাদের দারিদ্র্য গুজরাটের দলিত বা আদিবাসী হিন্দুদের থেকেও ৫০ শতাংশ বেশি। গোধরা কাণ্ড পরবর্তী দাঙ্গা ও তাতে কয়েক হাজার মুসলিমের পাশবিক হত্যা একবিংশ শতকের ভারতীয় রাজনীতির একটা ল্যান্ডমার্ক। মোদী-বিরোধীদের প্রচারের মূল অস্ত্রও এখনো গোধরা কাণ্ড। কিন্তু মোদীর রাজনীতি যাইহোক না কেন, তার সাফল্যের জাদুকাঠি তার উন্নয়ন মডেল। ভারতীয় রাজনীতিতে যে দলই ক্ষমতায় আসুক না, বদলায় না চিদাম্বরম, মন্টেক সিং আলুয়ালিয়া-র মতো বাজারমুখী ব্যক্তিত্ব, ঠিক সেই কারণেই যে দল বা যে জোটই সরকার গঠন করুক না কেন, পলিসি রূপায়ণের অভিমুখ বদলাতে পারে না। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের দৈনন্দিন বেঁচে থাকার সংগ্রামকে গুলিয়ে দেওয়া যেতে পারে কখনও ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতার গল্প ফেঁদে,

কখনও উদারনীতি আর দুর্নীতির মুখকে 'আম আদমি' মুখোশ দিয়ে ঢেকে রাখার গেম শো সাজিয়ে।

আরএসএস-র রাজনীতি আর বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মিথোজীবিতা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ আর ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় এলে শিক্ষায় গেরুয়াকরণ বাড়বে। শহুরে 'শিক্ষিত' উচ্চ ও মধ্যবিত্তের হিন্দু মনন আরো হিন্দু হবে। ভারত রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের সাম্প্রদায়িকতা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের বেঁচে থাকার সুযোগকে আরো খানিক সংকুচিত করবে। সংকুচিত হবে গণতন্ত্র, মতপ্রকাশের অধিকার, প্রতিবাদ করার, বিরোধিতা করার অধিকার। শোষিত, অত্যাচারিত, উচ্ছেদগ্রস্ত মানুষের কণ্ঠ হবে আরো খানিক প্রান্তিক। হয়ত আরো খানিকটা ফ্যাসিস্ট কায়দায়। কিন্তু এসবে স্বার্থ সিদ্ধি হবে পুঁজির, উল্টো দিকে পরিসর বাড়বে মুনাফার।

জোর বাড়বে আরএসএস-এর। তাদের পথ চলা শুরু ১৯২৫ সাল থেকে, একটি একক ঐক্যবদ্ধ হিন্দু-রাষ্ট্র গঠনের আদর্শকে সামনে নিয়ে। সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে ঘোষিত এই সংঘের আজ ২০০০ সালে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে ৪৫,০০০ শাখা সংগঠন রয়েছে। ১৩,০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান, সাহিত্য সংগঠন থেকে শুরু করে সমাজকল্যাণ মূলক সংগঠন ইত্যাদি— সবটাই বিপুল অঙ্কের টাকার ব্যাপার। হিন্দু ধর্ম, হিন্দু সংস্কৃতি, আচার-ভাবনাকে অন্যান্য ধর্ম-সংস্কৃতির (মূলত মুসলিম ও খ্রিস্টান) তুলনায় উচ্চ স্থান দেওয়া এদের উদ্দেশ্য। সংঘ পরিবারের বক্তব্য ও ঐতিহাসিক ক্রমপর্যায় নিঃসন্দেহে আলোচনার দাবি রাখে, কিন্তু এই প্রবন্ধের কাজ শুধু উত্থাপনটুকুই। প্রকাশ্যভাবে ঘোষিত এই সাংস্কৃতিক সংগঠন যখনই (জনতা পার্টি জোট সরকারের ক্ষমতা পরবর্তী পর্যায়ে) বিজেপি-র মতো একটি রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন বোধ করল, তখনই তারা বুর্জোয়া গণতন্ত্রে অংশগ্রহণের প্রয়োজন বুঝেছিল। রাজনৈতিক ক্ষমতা যে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াকেই পরিপূরণ করে, এই বোধ তাদের রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে পরিণতি দিয়েছে। তাই মতাদর্শগতভাবে রাজনৈতিকভাবে হিন্দুরাষ্ট্রকর্মীদের সাম্রাজ্যবাদ বা বিদেশি পুঁজির যতটা বিরোধী হওয়ার কথা ভাবা হয়েছিল, বাজপেয়ী সরকার ক্ষমতায় এসে কিন্তু তার প্রমাণ দেয়নি। আর তাই, এই গল্পের নিরবচ্ছিন্নতায় মোদীর উত্থান নেহাতই কাকতালীয় নয়। এর পিছনে রয়েছে ভারতীয় 'গণতন্ত্র'-এ মানুষের কাছে মুখোশের বদলকামিতা, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের গভীর শিকড় আর সর্বগ্রাসী পরিণতির বাস্তবতা।

পরিশেষে

হিটলারের ফ্যাসিবাদের মেকি বিরোধিতায় নামলেও জার্মানির কনশেনট্রেশন ক্যাম্পের বন্দি ইহুদিদের বাধ্যতামূলক শ্রমের সুবিধা নিতে পিছপা হয়নি আমেরিকা সব পশ্চিমী দুনিয়ার 'গণতন্ত্র-প্রিয়' পুঁজিপতিরা। সেই একই সুর বজায় রেখে ২০০২-এর গণহত্যার গুজরাটে সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডের রক্ত লেগে থাকলেও নয়া উদারনীতির ভারতবর্ষে পুঁজির মৃগয়াক্ষেত্র হয়ে উঠতে অসুবিধে হয়নি এই রাজ্যের। মুনাফার সামনে দাঁড়িয়ে ফ্যাসিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা এইসব অনেক তুচ্ছ ইস্যু।

১৯৮০-এর দশকের শেষের দিক থেকেই শুরু হয় ভারতীয় রাজনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণ। শুধু বিজেপি নয়, কংগ্রেস তথা অন্যান্য দলের ভূমিকাও এই প্রক্রিয়াতে কিছুমাত্র কম থাকেনি। বাবরি মসজিদ নিয়ে ১৯৮৬ সালে তৎকালীন রাজীব সরকারের সিদ্ধান্ত ইন্ধন যুগিয়েছিল রথযাত্রা এবং ১৯৯২-এর বাবরি ধ্বংসের পরিণতিতে। আর একই সময় থেকে ভারতীয় সমাজ অর্থনীতিতে থাবা বসাতে শুরু নয়া-উদারনীতিবাদ। মোদীর গুজরাট এই দুই অশুভ শক্তির রামধনু জোটের এক প্রাথমিক পরীক্ষাগার মাত্র। আর ভারতের রাজনীতিতে প্রচলিত দলগুলোর প্রত্যেকেই কমবেশি অবস্থান করছে এই নয়া-উদারনীতি আর সাম্প্রদায়িকতা যুগলবন্দীর বৃত্তের মাঝে। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে সাম্প্রদায়িকতা আর নয়া-উদারনীতির এই যুগলবন্দীর বিরুদ্ধে দেশজোড়া গণ-আন্দোলনই হতে পারে একমাত্র কার্যকর প্রতিরোধ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১। *নরেন্দ্র মোদীর গুজরাট— মিথ বনাম বাস্তবতা*, সুমনকল্যাণ মৌলিক, প্রসঙ্গ সমকাল

২। 'Laboratory of Facism— Capital, Labour and Environment in Modi's Gujrat'— Rohit Prajapati & Trupti Shah, *Radical Socialist*.

বাণিজ্যিক নয়, মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা।

পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার ফোন নম্বর

৯৮৩০৯২২১৮৪ বা ৯৩৩১০১২৫৩৭

প্রবন্ধ

আরব দুনিয়ায় ঘূর্ণিঝড়

অরিজিৎ

বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের কাছে এক হতাশা নিয়ে শেষ হয়েছিল আগের শতাব্দী। মুক্ত মানুষের দুনিয়া গড়ার স্বপ্ন হঠাৎই যেন হোঁচট খেয়েছিল, আর মানুষের ঘাড়ে জাঁকিয়ে বসতে শুরু করেছিল শোষণ আর নিষ্পেষণের জোয়াল। স্বৈরতন্ত্র আর ধর্মীয় সংস্থাগুলোর রাজনৈতিক জোটের হাত ধরে নয়া উদারনীতি কায়েম হচ্ছিল গোটা পৃথিবীতে। নতুন শতকের দ্বিতীয় দশক অর্থাৎ এই দশকের শুরুটা যেন উল্টো হাওয়ায় বার্তা নিয়ে এলো। আরব দুনিয়ার রাজনীতির ওলটপালট, অকুপাই আন্দোলন, জনগণের প্রতিবাদী হয়ে ওঠা আবার আশার সঞ্চার করেছে। সেগুলির ছাপ এসে পড়েছে আমাদের উপমহাদেশেও। এই আন্দোলনগুলোকে তাই গভীরভাবে জানা-বোঝার দরকার আছে। প্রয়োজন আছে কাটাছেঁড়া করার, বিশেষত আরব দুনিয়ার দেশগুলিকে নিয়ে।

২০১০-এর ডিসেম্বরে উত্তর আফ্রিকার ছোট্ট একটা দেশ টিউনিশিয়ার বিক্ষোভ আর তাতে স্বৈরতন্ত্রী শাসক বেন আলির পতনের মাধ্যমে এ বিদ্রোহের সূচনা। তারপর মিশর, লিবিয়া, সহ উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ার অন্যান্য দেশে বিক্ষোভ-বিদ্রোহ আর শাসকের দমন-পীড়ন, চলতেই থাকছে। যে শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, তার উত্থানের ইতিহাসের দিকে আগে চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক।

ইতিহাসের পাতা থেকে : প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের অনেক জায়গা তুর্কিদের অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনস্থ ছিল। ধর্মগতভাবে মূলত মুসলমান হলেও বহু জাতি আর উপজাতিতে বিভক্ত ছিল তারা। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ছিল কঠোর ধর্মীয় অনুশাসন এবং সামন্ততান্ত্রিক জীবনযাপন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অটোমান শাসকরা জার্মানির পক্ষ নেওয়ায় ব্রিটেন আর ফ্রান্স আরব জনগণের পাশে দাঁড়ায় তাদের তুর্কি শাসন থেকে 'মুক্ত' করতে। যুগ যুগ ধরে যা হয়ে এসেছে সেবারেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ব্রিটেন আর ফ্রান্স আরব দুনিয়ায় তাদের ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম করে। যেখানে প্রত্যক্ষভাবে সম্ভব হয়নি সেখানে ওমর, শেখ, সুলতানদের মাধ্যমে বকলমে টিকে থেকেছে ফ্রান্স বা ব্রিটেনের সাম্রাজ্য। ঔপনিবেশিক পর্যায়ে কিছু নদী অববাহিকায় কৃষি সংস্কার আর হাতে গোনা কিছু শিল্প স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে এ অঞ্চলে বিপুল খনিজ তেলের ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হলে মুনাফালোভীদের গোটা দৃষ্টিটা চলে যায় তেল উৎপাদন, পরিশোধন, রপ্তানি আর তৈলজাত শিল্পের দিকে। তার প্রযুক্তি আর পুঁজি ছিল পুরোপুরি ব্রিটেন আর ফ্রান্সের। আর মুনাফাও তাই বিদেশে পাচার হয়ে যেত। শুধু তৈলক্ষেত্রগুলো থেকে ভাড়া বাবদ কিছু মুনাফা থেকে যেত দেশীয় মুষ্টিমেয় কিছু সামন্তপ্রভু, রাজা, সুলতান, শেখ, ওমর কিংবা ধর্মীয় নেতাদের হাতে। মুনাফার সেটুকু অংশও তারা দেশে উৎপাদন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করেনি। একটা অংশ খরচ হয়েছে বিলাস-বৈভবে, আর একটা অংশ ক্রমশ বেনিয়া পুঁজি হয়ে উঠতে শুরু করল। নিত্যপ্রয়োজনীয় ও ভোগ্যবস্তুর বাজার দখল করল বহুজাতিক কোম্পানিগুলো। মুনাফা-অর্জনের উপায় যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও এক রকমের বিকৃত বিকাশ হল আরব দুনিয়ায়। একদিকে রিয়েল এস্টেট, পর্যটন, হোটেল, আমোদ প্রমোদের ঝাঁ চকচকে উন্নয়ন, আর অন্যদিকে জনগণের মরুভূমির মতই রিক্ত জীবনের বাস্তবতা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আরব দুনিয়া

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীতে পুরনো ধরনের ঔপনিবেশিক যুগ যখন আর রইল না তখন একে একে তারা স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। কিন্তু বাস্তবে তারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অধীনস্থ থেকে গেল, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেই শক্তিটি এখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ।

আর একটা বড় পরিবর্তন ঘটে গেছে। আরব দুনিয়ার আপত্তিতে কান না দিয়ে প্যালেস্টাইনের প্রায় গোটা দেশটা দখল করে মার্কিন ও ব্রিটিশ মদতে তৈরি হয়েছে ইজরায়েল। আরব দুনিয়ায় মার্কিন তথা পশ্চিমা শক্তির এক ঘাঁটি। এর পরে সোভিয়েতও খোলনলচে বদলে ফেলে বিভিন্ন দেশকে অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্যের নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। এহেন বাস্তবতায় আরব দুনিয়া জুড়ে দুরকম লক্ষণই দেখা গিয়েছে। মিশর, সিরিয়া, লিবিয়ার সোভিয়েত মডেলে রাষ্ট্রায়ত্তকরণ এবং উল্টোদিকে অন্যান্য দেশগুলোয় বেসরকারি ব্যবস্থা, দরজা খুলে দেওয়ার নীতি—অবাধ লুঠতরাজ।

নানা দেশ নানা ব্যবস্থা

স্বাধীনতার পর গণতন্ত্র, নির্বাচন চালু হলেও অচিরেই বেশির ভাগ দেশে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন কায়েম হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জারি থেকেছে মিলিটারি শাসন আর সেনানায়কের একনায়কতন্ত্র। প্রবল রাষ্ট্রীয় নজরদারি। মিটিং-মিছিল, সংগঠিত হওয়া, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার মত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ছিটেফোঁটাটুকুও নেই। সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রনাধীন। শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-বুদ্ধিজীবী-কর্মচারী-নারী—প্রতিটি অংশের ওপর চাপানো ছিল নানান নিষেধাজ্ঞার

বেড়াজাল। আর এর পেছনে ছিল সাম্রাজ্যবাদী মদত।

টিউনিশিয়া : টিউনিশিয়ায় ১৯৫৬ সালে স্বাধীনতার পর ক্ষমতা দখল করে দেশীয় সামন্ততন্ত্রের প্রতিনিধিরা, ১৯৮৭তে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে সেনানায়ক বেন আলি। দেশটি স্বাধীনতা-উত্তর কালে বরাবর মার্কিন সাম্রাজ্যের একান্ত অনুগত, মিলিটারিও মার্কিন প্রশিক্ষিত। বস্ত্র আর ফসফেট খনিশিল্প ছাড়া অন্য উপার্জনের রাস্তা পর্যটন আর রপ্তানি শিল্প। বেকারির হার বেড়েছে বছর বছর।

মিশর : মিশরে ১৯৫২ আর '৫৪-তে দুটি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেনানায়ক নাসের ক্ষমতায় আসেন। পতন হয় ব্রিটিশ উপনিবেশের। প্রাথমিক পর্যায়ে নাসের সোভিয়েতের সাথে হাত মিলিয়ে বড় ও মাঝারি শিল্পের জনপ্রিয় জাতীয়করণের পন্থা নেন। আংশিক হলেও ভূমি সংস্কারের পদক্ষেপ নেন। তবে তার সাথে থাকে জনগণের স্বাধীন উদ্যোগগুলো ছেঁটে ফেলা, ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার থেকে শ্রমিকদের বঞ্চিত করা আর সমস্ত রকম গণতান্ত্রিক পরিসরে দমনপীড়ন। বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলের অনুমোদন বাতিল হয়। সোভিয়েতের সাথে সম্পর্কের জেরে মিশরের কমিউনিস্টরাও নাসেরের দলে ভিড়ে যায়। ১৯৭০ সালে নাসেরের পর আনোয়ার সাদাত যখন ক্ষমতায় আসে তখন সে চলতে শুরু করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অঙ্গুলিহেলনে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বেসরকারিকরণ শুরু হয়। মুবারকের শাসনকালে সেই যাত্রা অব্যাহত ছিল।

উদারীকরণের নীতি মিশরের অর্থনীতির খোলনলচে বদলে দেয়। ৮০ শতাংশ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা কয়েকটি একচেটিয়া কোম্পানির হাতে চলে যায়। অবশিষ্ট রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোতেও কর্মী সংকোচন চলতে থাকে। উৎপাদনভিত্তিক শিল্প থেকে বিনিয়োগ সরে আসে পর্যটন, রিয়েল এস্টেট, আমদানি-রপ্তানি আর আর্থিক ক্ষেত্রের দিকে। একদিকে যেমন বেকারি বেড়েছে, তেমনই সরকার ভর্তুকি তুলে নেওয়ার খাদ্যদ্রব্য আর জ্বালানির দাম হয়েছে আকাশছোঁয়া।

সিরিয়া : স্বাধীনতা-উত্তর সিরিয়ার বেশ কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। ১৯৪৬-এ ফ্রান্সের থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার পর সংসদীয় নির্বাচন হলেও ১৯৭০ সালে সামরিক অভ্যুত্থান মারফত বাথ পার্টি ক্ষমতায় আসে। প্রেসিডেন্ট হয় হাফিজ আল-আসাদ। ২০০০ সালে তার মৃত্যুর পর থেকে ক্ষমতায় আসে তাঁরই পুত্র বাসার আল-আসাদ। প্রথম দিকে মিশরের মত সিরিয়াও শিল্প সংস্থাগুলোর রাষ্ট্রায়াত্তকরণের মাধ্যমে দেশকে সমাজতান্ত্রিক ঘোষণার পথে হেঁটেছিল। সরকারি বদান্যতায় যারা অর্থবান হয়েছেন তাঁরাও মিশরের মতই উৎপাদন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ না করে আমদানি-রপ্তানি, রিয়েল এস্টেট, আর্থিক ক্ষেত্র ইত্যাদি জায়গায় বিনিয়োগ করেছে, বিশেষ করে উদারীকরণের পর থেকে। এর সাথে বাথ পার্টির ইউনিয়ন ছাড়া অন্য ইউনিয়ন করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে শ্রমিকদের। সিরিয়ার রাজনীতির সাথে আবার জড়িয়ে আছে প্যালেস্তাইনের জনগণের জাতীয়তাবাদের বিষয়টি। প্যালেস্তাইনের ইজরায়েল ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী হামাহ গোষ্ঠী এবং লেবাননের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী হিজবুল্লাহ গোষ্ঠীর সাথে সিরিয়ার শাসকদের মিত্রতা এক অন্য রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি করেছে। কারণ এই দুটো গোষ্ঠীই সাম্রাজ্যবাদের ভাষায় সন্ত্রাসবাদী। এছাড়া এখনো সিরিয়ার সাথে ইরান আর রাশিয়ার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। তার সাথে আছে সিরিয়ায় আছে অভ্যন্তরীণ জাতি সমস্যা— শিয়া-সুন্নী কিংবা খ্রিস্টান ইত্যাদি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অঞ্চল ভেদে বসবাস এবং ক্ষমতার কেন্দ্র তৈরি হওয়া কিংবা আরব-কুর্দ ইত্যাদি জাতিগত প্রভেদ। একদিকে সাম্রাজ্যবাদের প্রতি অনমনীয় মনোভাবের সদর্থক বৈশিষ্ট্য, অন্যদিকে ধর্মীয় সংগঠনগুলোর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা আর কঠোর মিলিটারি শাসনের মাধ্যমে জনগণকে দমনপীড়নের নঞর্থক দিক।

লিবিয়া : বহু উপজাতি অধ্যুষিত লিবিয়া রাষ্ট্র গঠিত হয় ১৯৪৩ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে, তিনটি অঞ্চলকে একত্র করে। পরবর্তীতে ব্রিটিশ অনুগত রাজা ইদ্রিসের আমলে ১৯৫৯ সালে লিবিয়ায় বিপুল তেলভাণ্ডার আবিষ্কার হওয়ার পর দরিদ্র দেশ লিবিয়ার চরিত্র বদলে যায়। ১৯৬৯ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মারফত ক্ষমতায় আসে গদ্দাফি। সোভিয়েতের সাথে হাত মিলিয়ে জাতীয়করণের কর্মসূচি গৃহীত হয়। সাম্রাজ্যবাদী দেশের কোম্পানিরা তেলের খনিগুলো থেকে হাত গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। লিবিয়াতে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটি তুলে দেওয়া হয়। লাতিন আমেরিকা আর প্যালেস্তাইনকে সাহায্য করার নীতির জন্য 'সন্ত্রাসবাদের মদতদাতা' হিসেবে চিহ্নিত হন গদ্দাফি। গদ্দাফি গোঁড়া ধর্মীয় সংস্থাগুলোকে কড়া হাতে মোকাবিলা করেছেন বহুদিন, বরং সৌদি আরবের মারফত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদই ঐসব সংস্থাগুলোকে মদত জুগিয়েছে গদ্দাফির বিরোধিতা করার জন্য।

গোটা সাম্রাজ্যবাদী শিবির একসময় লিবিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের পথে যায়। বহু উপজাতির দেশে সংখ্যাগতভাবে ক্ষুদ্র উপজাতির প্রতিনিধি হিসেবে গদ্দাফি শাসন টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের নামে নিজের অনুগত এবং বিরোধী উপজাতি গোষ্ঠীগুলোর প্রধানদের মধ্যে শাসন আর মুনাফার উৎসগুলো ভাগ বাটোয়ারা করে। সোভিয়েতের পতনের পর অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখে পড়ে লিবিয়া বাধ্য হয় সাম্রাজ্যবাদের দ্বারস্থ হতে। তেলখনিগুলোর বেসরকারিকরণ শুরু হয়। সাম্রাজ্যবাদী শিবিরও অর্থনৈতিক অবরোধ তুলে নেয়। কিন্তু খনিজ তেলের শুল্ক বাড়িয়ে, বারবার

খনিজ তেলের পুরোপুরি জাতীয়করণের হুমকি দিয়ে আন্তর্জাতিক তেলের বাজারে দরকষাকষি শুরু করায় আর গত দশক থেকে চীনের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে গদ্দাফি হয়ে ওঠে বড় শত্রু। গদ্দাফিকে সরিয়ে সেদেশে পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা করার তাগিদ জোরদার হয়ে ওঠে।

গত তিন বছরে মধ্যপ্রাচ্যের যে চারটি আভ্যন্তরীণ দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বেসামাল হয়ে উঠেছে আর রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছে এই হলো সেগুলোর প্রেক্ষাপট। আলজেরিয়া, ইয়েমেন, বাহারিন, সৌদি আরবের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একান্ত বশংবদ দেশগুলিতে কিছু সংস্কারের মাধ্যমে সামাল দেওয়া গেছে। গোটা মধ্যপ্রাচ্যের সমস্ত দেশে শাসক হিসেবে সেনানায়ক কিংবা স্বৈরাচারী শাসক বা পুরোনো রাজতন্ত্রের প্রতিনিধি যেই আসীন থাকুক না কেন, ধর্মীয় সম্প্রদায়, জাতি বা উপজাতির প্রতিনিধিত্ব করুক না কেন, শাসনতন্ত্র কিন্তু চলেছে শ্রেণীরাজনীতির খাতেই। একটা ক্ষুদ্র শ্রেণীর ক্ষমতার ভাগবাঁটোয়ারার গতিশীল ভারসাম্যই গত কয়েক দশকের ইতিহাস। টিকে থাকতে হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে, নয়তো মোকাবিলা করে করে। কিন্তু এটা বাদ দিলে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রশ্নে, দমনপীড়নের প্রশ্নে, কিংবা কর্মসংস্থান, বেকারি বা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের প্রশ্নে প্রচুর মিল আছে দেশগুলোর। মিশর, টিউনিশিয়ার একরকম ক্রীড়নক হয়ে থাকার ইতিহাস। আর সিরিয়া, লিবিয়ার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার ইতিহাস। ঠাণ্ডাযুদ্ধের পর্যায়ে এক রকমের অবস্থা, পরবর্তীতে আর এক রকম। কোনো দেশে গোঁড়া ধর্মীয় গোষ্ঠীর জঙ্গি কার্যকলাপের মদত দেওযার নীতি, আবার কোথাও কঠোরভাবে মোকাবিলা করার নীতি— অমিল ও বিস্তর।

সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ

সাম্রাজ্যবাদী শিবির, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, বিগত বছরগুলির টালমাটাল অবস্থায় মধ্যপ্রাচ্যের জীবনের সাথে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। তার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ যদি হয় ঐ অঞ্চলের খনিজ তেলের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা, পাশাপাশি অসংগঠিত ক্ষেত্রের বিপুল সস্তা শ্রমিক, উঠতি অভিজাতদের বিপুল মার্কেটও অন্যতম কারণ। তার সাথে আছে সুয়েজ খালের ওপর আধিপত্য বজায় রাখা। এবং চীন-ইরান-রাশিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক দ্বন্দ্বে মধ্যপ্রাচ্যকে ব্যবহার করা। যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিগত দশকগুলোতে লাতিন আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকার দেশগুলোতে সাধারণ জনগণকে দমন করার স্বৈরাচারী শাসকদের নির্লজ্জভাবে মদত দিয়ে গেছে, সেই তাদের গলায় রাতারাতি ভোল পাল্টে গণতন্ত্রের মধুর বাণী কি স্বাভাবিক? আসলে এগুলো নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য সাম্রাজ্যবাদী সমীকরণ। এরা এমনকি অতি বশংবদ শাসককেও ছুঁড়ে ফেলে দিতে দ্বিধাবোধ করে না যদি তারা মসৃণভাবে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ, অর্থনৈতিক মুনাফা আর রাজনৈতিক ক্ষোভগুলোকে মোকাবিলা করতে না পারে— সেই দেশের জনগণের বিক্ষোভ, সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে যদি সেই দেশটা সাম্রাজ্যবাদের হাতে বাইরে চলে যায়। তাই মিশর বা টিউনিশিয়ার শাসকের বদল করার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তারা নিশ্চিত হতে চেয়েছে যে স্বৈরাচারী শাসকদের বদলে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করলে নতুন শাসক তাদের বশ্যতা স্বীকার করবে কিনা। মোদ্দা কথা, তারা এই দেশগুলোতে পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আর উল্টোদিকে সিরিয়া-লিবিয়ার শাসকরা তার ঘোর বিরোধী, সুতরাং তারা 'স্বৈরতন্ত্রী', 'সন্ত্রাসবাদী'। সেখানে নিজেদের খবরদারি কায়েম করতে হলে এই শাসকদের উচ্ছেদ করার জন্য হস্তক্ষেপ করতে হবে, এ আবার নতুন কথা কী? এই হস্তক্ষেপ চলছে লিবিয়াতে গদ্দাফি-বিরোধী নানান উপজাতিদের বিভিন্ন মৌলবাদী সংগঠন, এমনকি লিবিয়ান ইসলামিক ফাইটিং গ্রুপ বা তালিবানের মত মার্কিন আখ্যায়িত 'সন্ত্রাসবাদী' দলের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া মারফত, এদেরই জোটের অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে, ন্যাটো কর্তৃক সর্বগ্রাসী হামলার মাধ্যমে। সিরিয়ায় মূলত সৌদি আরব আর ইজরায়েলের মাধ্যমে মুসলিম ব্রাদারহুড এবং সুন্নি সালাফি, ওয়াহাবিদের উস্কানিদানের মাধ্যমে, নানান অন্তর্ঘাতী হামলা ক'রে। টিউনিশিয়ায় বেন আলিকে প্রথমে পদত্যাগের জন্য পরামর্শ ও পরে চাপ দিয়ে। মার্কিন প্রশিক্ষিত একান্ত অনুগত টিউনিশিয়ার মিলিটারি সাম্রাজ্যবাদের অঙ্গুলি হেলনেই বিদ্রোহীদের সমর্থন করে। মিশরে মূলত শক্তিশালী মুসলিম ব্রাদারহুড আর মিলিটারিকে প্রত্যক্ষ সমর্থন করা হয়।

এর সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকেছে ধর্মীয় সংগঠন। এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ দেশগুলোতেও জনগণের সাধারণ উদ্যোগকে তোয়াক্কা না করে ওপর থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা চাপিয়ে দেওয়ার ফলে নানান গোঁড়া ধর্মীয় সংগঠন মানুষের ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের বিস্তৃতির কাজ করে গেছে। আর এ কাজে পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা করে গেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দোসর সৌদি আরব। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন সাহায্যপুষ্ট মুসলিম ব্রাদারহুড, বহু দেশে এদের শাখা আছে। মূলত আরবের তেল ব্যবসায়ের টাকায় এদের রমরমা। এরা গোঁড়া ধর্মীয় সংগঠন। অতীতেও এদের জঙ্গি কার্যকলাপের ইতিহাস আছে। ৫০-এর দশকে অভ্যুত্থানের সময় এরা নাসেরকে সমর্থন জানালেও পরবর্তীকালে নাসেরের জাতীয়করণ নীতির বিরোধিতা করে, সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থকে মাথায় রেখে। সে সময়ে মিশরে মুসলিম ব্রাদারহুড নিষিদ্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে সাদাত ও মুবারকের জমানায় মিশরে এরা প্রতিপত্তি বাড়াতে শুরু করে। ধর্মীয় সংগঠনের মাধ্যমে দাতব্যমূলক/ সেবামূলক কাজ করে এরা জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

২০০৫-এর নির্বাচনে এরা অন্য নামে অংশগ্রহণ করে এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আসনে জয়লাভও করে।

আরব বসন্ত ও তার পর

এই রকম একটা পরিস্থিতিতে এই দেশগুলোতে বিদ্রোহ শুরু হয়। একদিকে বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, আর দমবন্ধ করা অগণতান্ত্রিক বাতাবরণ। অন্যদিকে নব্য যুবসম্প্রদায় মোবাইল, ইন্টারনেটের মাধ্যমে পারস্পরিক ও গোষ্ঠীর দুনিয়ার সাথে যোগাযোগ রাখে। একটা অর্থনৈতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে গত দশকেই মিশর ও টিউনিশিয়ায় শুরু হয়েছিল লাগাতার শ্রমিক আন্দোলন। ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি আর স্বাধীন ইউনিয়ন করতে দেওয়ার দাবিতে বারবার শ্রমিকরা ধর্মঘট ও বিক্ষোভ করেছে মুবারক জমানায়। ২০০৮-এর মাহাল্লা শিল্পাঞ্চলের আন্দোলনের সাফল্য শ্রমিকশ্রেণী ও সাধারণ মানুষের মনে উদ্দীপনা সঞ্চার করে। যার ফলশ্রুতিতে ছোটোখাটো লাগাতার আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে এবং সেই আন্দোলন ২০১১-র ফেব্রুয়ারিতে মুবারককে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। আন্দোলনের ওপর দমনপীড়ন শুরু করলেও পরে সামরিক বাহিনী আন্দোলনকারীদের সাথে যোগ দেয়। মুসলিম ব্রাদারহুডও প্রথমে আন্দোলনে ছিল না, কিন্তু যখন মুবারকের পতন আসন্ন তখন ফ্রিডম অ্যাণ্ড জাস্টিস পার্টি তৈরি করে সংগঠন গুছোতে থাকে।

মিশরে বিদ্রোহ শ্রমিক আন্দোলনের ভিত্তির ওপর তৈরি হলেও শ্রমিকরা শ্রেণী হিসেবে সংঘবদ্ধ না হওয়ার কারণে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয় এবং আন্দোলন প্রকৃত অর্থে নেতাবিহীন জনগণের বিদ্রোহে পরিণত হয়। জনগণের বিপুল অংশগ্রহণের পাশাপাশি অন্তরালে থেকে গিয়েছে সাম্রাজ্যবাদ, সামরিক বাহিনী আর মুসলিম ব্রাদারহুডের আঁতাত। মুবারকের পতনের পর ক্ষমতা দখল করল মিলিটারির সর্বোচ্চ সংস্থা 'সুপ্রিম কাউন্সিল'। ক্ষমতায় এসেই তারা সমস্ত রকম ধর্মঘট, শ্রমিকদের দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। দেশের অর্থনীতিকে 'সচল রাখার জন্য' শ্রমিকদের কারখানায় ফিরে যাওয়ার ডিক্রি জারি হয়। সামরিক বাহিনীর সাথে গলাও মেলায় আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী এলিট অংশ ও মুসলিম ব্রাদারহুড। এরা নীতিগতভাবে শ্রমিক আন্দোলনের বিরোধী। এরা ব্যক্তিগত সম্পত্তির পক্ষে, এবং মিশরকে এরা ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়। মুবারক জমানার রাজবন্দিদের মুক্তি হয় না, বরং নতুন জমানায় শ্রমিক আন্দোলন দমন করার জন্য যে রকম ধরপাকড় চলে তা মুবারক জমানাকেও হার মানিয়ে দেয়।

সুপ্রিম কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে নতুন যে সংবিধান রচিত হয় তা মূলগতভাবে আগের জমানার থেকে আলাদা কিছু নয়। সংবিধানের ২ নং ধারা অনুযায়ী আগের মতই শরিয়ত আইন বলবৎ থাকছে। মিশর চলছে মুক্ত বাজার অর্থনীতির পথেই। জুন, ২০১২ তে নির্বাচন হলেও মিলিটারি তার সমস্ত ক্ষমতা ত্যাগ করে ব্যারাকে ফিরে যাচ্ছে না। অবশ্য মিশরের গত ৬০ বছরের ইতিহাসই সামরিক বাহিনীর ক্ষমতার ইতিহাস, মুবারকের পতনের ব্যাপারেও মার্কিন অনুচর মিলিটারির আন্দোলনে অংশগ্রহণ নির্ধারক ভূমিকা পালন করেছে। প্রাক নির্বাচন পর্বে মিশরে যেমন মুসলিম ব্রাদারহুড, বিভিন্ন সালাফি দল অর্থাৎ বিভিন্ন জেহাদি গোষ্ঠীর ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল ছিল, তেমনই ছিল নানান মধ্যপন্থী দল, নানান ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ দল, এবং খুব ক্ষুদ্র কয়েকটি সোস্যালিস্ট আর কমিউনিস্ট গ্রুপ। গোটা আন্দোলন নেতৃত্ববিহীন হওয়ার জন্য সংগঠনের গুরুত্ব সে সময় অনুভূত হয়নি এবং সেজন্যই বিভিন্ন অংশের রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা নির্বাচনে ঠিকমতো অংশগ্রহণ বা জোট গঠন করে উঠতে পারে নি আর তার ফায়দা তুলেছে সংগঠিত মুসলিম ব্রাদারহুড। রাজনৈতিক ইসলামের দীর্ঘদিনের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ মুসলিম ব্রাদারহুড জুন, ২০১২-তে ক্ষমতায় এসেই প্রেসিডেন্ট 'মোরশি'র নেতৃত্বে নিজেদের মতো করে মিশরকে তৈরি করার নক্সা বানায়, যার মধ্যে নিহিত ছিল ইসলামিক বিপ্লবের বীজ। ক্ষমতায় আসীন হয়ে তারা মনে করে মিশরকে তাঁদের ধাঁচায় একটা উগ্র ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করার বহুদিনের কাঙ্ক্ষিত সুযোগ তাদের হাতের মুঠোয়। আর এ ধারণাও তাদের হয় যে তারা অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তারা নানান পরিবর্তন আনে যা রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রে আঘাত হানতে শুরু করে। নতুন অর্থনৈতিক নীতিগুলোও ফলপ্রসূ হয় না। ফলে ২০১২-১৩ সময়পর্বে অস্থিরতা এবং শ্রমিক ধর্মঘট, অবস্থান, বিক্ষোভ বাড়তে থাকে। সংবিধান পরিবর্তন করে ইসলাম রাষ্ট্রে পরিবর্তন করার নতুন খসড়া সংবিধান পেশ করলে তা নিয়ে বিক্ষোভ শুরু হয়। এমনকি লিবারল ও বামপন্থীরাও পুরোনো জামানার অন্য অংশগুলির সাথে যুক্ত হয়ে বৃহৎ ব্রাদারহুড-বিরোধী ব্যানার তৈরি করে। এছাড়াও প্যালেস্তানীয় জনগণের বিরুদ্ধে মিশরের পদক্ষেপের ব্যাপারও যথেষ্ট গুরুত্ব নিয়ে হাজির ছিল।

এ বছর এপ্রিল মাস থেকে নতুন আন্দোলন শুরু হয়। এর একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল মোরশি, অর্থাৎ মুসলিম ব্রাদারহুডের অপসারণের দাবিতে স্বাক্ষর সংগ্রহ। জুনের মাঝামাঝি দেড় কোটি স্বাক্ষর সংগৃহীত হয়, যা এক বছর আগে মোরশি-র প্রাপ্ত ভোটের চেয়েও বেশি। ৩০ জুন বিরাট জনসমাবেশের আহ্বান জানানো হয় এবং তাহিরির স্কোয়ার সহ কায়রোর রাস্তাঘাট ভরে যায় মোরশির অপসারণের দাবিতে। এমন একটা মুহূর্তে সামরিক বাহিনী আবার রাজনৈতিক পরিসরে হস্তক্ষেপ করে, ৩ জুলাই মোরশিকে সরিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধানের নেতৃত্বে একটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তৈরি করে। মোরশি-র অপসারণের বিরুদ্ধে ব্রাদারহুড সমর্থকরা পথে নামে। কিন্তু তাদের ওপর ব্যাপক দমনপীড়ন চালানো হয়। ৩ জুলাই থেকে এখনো

অবধি সামরিক বাহিনীর হাতে দেড় হাজারেরও বেশি ব্রাদারহুড সমর্থক নিহত হয়েছে। তাদের 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যাও দেওয়া হয়েছে। মিলিটারিকে রাষ্ট্রের থেকে আলাদা করে দেখাটাই ভুল হয়েছিল মুবারকের পতনের পর। সেই ভুলই আবার একটা সামরিক শাসনের পত্তন করতে চলেছে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা থেকে বেরিয়ে স্বাধীন হওয়ার পর বার বার যা ঘটেছে।

অতীত দুবছরের বিদ্রোহের স্মৃতি এখনো মানুষের বিদ্রোহ স্পৃহাকে জাগিয়ে রেখেছে বলে স্বপ্ন দেখা সম্ভব হচ্ছে। না হলে আবার সামরিক শাসন থেকে মুক্তির সম্ভাবনা দেখা যেত না। প্রথমত ব্রাদারহুডের এমন সংগঠিত শক্তিকেও যে বাহিনী এতো সহজে লোপাট করে দিতে পারে যে কোনো রকমের বিদ্রোহ সে কেমনভাবে দমন করবে তা সহজেই অনুমেয়। তাদের ইজরায়েল নীতি কিংবা মার্কিন মিলিটারির সাথে সুসম্পর্কও চিন্তার উদ্রেক করছে।

আরব বসন্তের এমন গৌরবোজ্জ্বল লড়াইয়ের পর তার এমন হতাশাজনক পরিস্থিতির জন্য দায় বর্তাচ্ছে বামপন্থী শক্তিগুলোর একত্র না হতে পারার ওপর। যে সমস্ত দাবি নিয়ে আন্দোলন হল এবং মুবারকের পতন হলো, নতুন সরকার কি সেই দাবিদাওয়া পূর্ণ করবে? একমাত্র বিপ্লবীরাই তা পারে। কিন্তু নির্দিষ্ট আদর্শ-বিহীন, নেতৃত্ববিহীন একটা আন্দোলন পুরনো শাসনকে উচ্ছেদ করতে পারে বটে কিন্তু একটা নতুন সমাজ কোনোমতেই তৈরি করতে পারে না, বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। এ ধরনের আন্দোলন হয় মাঝপথে থেমে যায়, নতুবা অন্যদের অ্যাজেন্ডাগুলোর লেজুরবৃত্তি করতে বাধ্য হয়। মিশরে ঠিক তাই-ই ঘটেছে। মোবারকের পতনে যে রাজনৈতিক শূন্যতার জন্ম হল তার সদ্ব্যবহার করল আগে থেকে সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তি মুসলিম ব্রাদারহুড। কিন্তু তাদের অপদার্থতা ও বাস্তববর্জিত নীতিগুলো তাদের দিকেই বুমেরাং হয়ে ফিরে এসেছে। তাদের সরকারের পতন ঘটেছে। মিশরে আবার অস্থিরতা তৈরি হয়েছে, অনভিপ্রেতভাবে সামরিক শাসন জারি হয়েছে। মোরশি-র পতনকে যেভাবে বামপন্থী এবং লিবারেলরা ত্বরান্বিত করল তাতে জনসমাবেশের মাধ্যমে তারাই ক্ষমতা ধরে রাখতে পারত, এটা আশা করা যেতে পারত। কিন্তু তারা সামরিক বাহিনী এবং মোবারকপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল ফেলুল-এর সাথে হাত মেলালো— যেন সামরিক শাসনই রাজনৈতিক সমস্যাগুলোর সমাধান করে দেবে।

মিশর-টিউনিশিয়ার এত শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন, জনপ্রতিরোধ সত্ত্বেও একথা বলতে হয় প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়েছে আমেরিকার আঙুল যে দিকে হেলে থেকেছে সেইদিকেই। টিউনিশিয়ায় পুতুল সরকার একরকম স্থিতিশীল হয়ে আছে। অন্যদিকে ২০১১-র অক্টোবরে ন্যাটোর হানায় গদ্দাফির মৃত্যু হয়েছে। লিবিয়াও সাম্রাজ্যবাদের করায়ত্ত। সিরিয়ায় এখনো লড়াই চলছে; স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে মৌলবাদের, আর মৌলবাদের সমর্থন নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের জনগণের ওপর সাম্রাজ্যবাদী হামলা চলছে। এবছরই আগস্টে দামাস্কাসে বিষাক্ত রাসায়নিক গ্যাসের হামলায় প্রাণ হারিয়েছে হাজারেরও বেশি মানুষ। সব মিলিয়ে সবচেয়ে সুবিধা হয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের।

এমন এক পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে যে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ও রাজনৈতিক সংগ্রাম প্রয়োজন সেরকম সচেতন বিপ্লবী পার্টির অনুপস্থিতি সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয়েছে। সংগ্রামের যে বাতাবরণটা রয়েছে তাকে ঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে আন্দোলনকে দিশা দিতে পারলে তা আগামীদিনে গোটা দুনিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনকে অক্সিজেন যোগাবে।

নিরাপত্তারক্ষীদের নিরাপত্তাহীনতা

১৩ পৃষ্ঠার পর

করা এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে ৫৪ শতাংশ শ্রমিক কর্মচারী ন্যূনতম মজুরি পান না। অথচ কাজের সময় ১২ ঘণ্টা। এই গার্ডদের গড় আয় ৫,৭১১ টাকা। আর তাঁরা ঘরে নিয়ে যেতে পারেন (take home wage) আরও কম।

সুতরাং মজুরির এই অবস্থার দিকে শিকারির চোখে তাকিয়ে আছে দেশি বিদেশি মালিকরা। আর ভারতবর্ষে যখন প্রতি মুহূর্তে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে বেকারের বাহিনী তখন ন্যূনতম মজুরির গল্প সরকারি কেতাবে বা সরকারি ট্রেড ইউনিয়নের দাবি সনদেই আবদ্ধ থাকবে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাম অর্থনীতির কেতাবে একেই বলা হয় সর্বহারার মজুত বাহিনী যা কিনা মজুরি আরও আরও নীচে নামাতে সাহায্য করে। পিকলু আর প্রসেনজিৎ ছিলেন এই বাহিনীর অংশ।

এ প্রসঙ্গে কয়েকদিন আগে নাগরিক সমাজ ও মূলধারার রাজনৈতিক নেতৃবর্গের মধ্যে এক বিতর্ক উপস্থিত হয়। ভারত রাষ্ট্রের বর্তমান কর্ণধাররা চাইছিলেন শিল্পপতি অনিল আম্বানির নিরাপত্তার জন্য সরকারি কমান্ডোর ব্যবস্থা করতে। এ নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয় নাগরিক সমাজে। রাষ্ট্রের কর্ণধাররা আপাতত পিছু হটেন। এবং অবশ্যই ভবিষ্যতের কোন অনুকূল পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষা করে থাকবেন। উদারবাদ সমাজে বিপুল বৈষম্যের জন্ম দিয়েছে। সুতরাং সমাজের উচ্চকোটির ব্যক্তি-বর্গের জন্য দরকার প্রাইভেট সিকিউরিটি। আর এই কাজে নিযুক্ত হবেন পিকলু-প্রসেনজিৎদের মত স্বাস্থ্যবান যুবকরা। অতীতে যেমন হাকিম শেখ, রামা কৈবর্তের সারির একদল যোগ দিতেন জমিদারদের লাঠিয়াল হিসাবে।

ব্যবহৃত তথ্যগুলি EPW, Aug, 2012 সংখ্যা থেকে নেওয়া হয়েছে।

সঞ্জয় বসু

প্রবন্ধ

শহিদ দাভোলকার ও কুসংস্কার-বিরোধী আন্দোলন— একটি বীক্ষণ

স্বপন শীল

ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে যে কেবল বিরোধী রাজনৈতিক মতাবলম্বীরা সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছেন তাই নয়, গণতান্ত্রিক ও সামাজিক আন্দোলনের কর্মীরাও আক্রান্ত হচ্ছেন, নিহত হচ্ছেন। তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ করার দাবিতে কর্মরত যাঁরা তাঁদেরও অনেকে আততায়ীর হাতে শহিদ হয়েছেন। এখন গণবিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মীরাও শহিদের তালিকায়। শহিদ নরেন্দ্র দাভোলকরের উদ্দেশে নিচের প্রবন্ধটি নিবেদিত হলো।

প্রতিবাদ ও আন্দোলনের ক্ষেত্রভূমিতে কুসংস্কার তথা অবৈজ্ঞানিক রীতি-নীতি ও বিশ্বাসের অনুশীলনের বিরোধিতা এবং তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন নতুন কিছু নয়। আমরা যদি আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বয়স ধরি ৩০০-৩৫০ বছর, তাহলে এর শুরু থেকেই এই বিরোধিতা ও কখনো কখনো আন্দোলন পাশাপাশি অবস্থান করেছে। ইতিহাসের যে কোন বিন্দুতেই সমাজের অধিকাংশ মানুষ গতানুগতিক বিশ্বাস ও রীতিনীতির প্রতি আস্থাশীল থাকে। তবে অল্প সংখ্যক হলেও কিছু মানুষ সমস্ত গতানুতিক বিশ্বাস ও রীতিনীতিকে অনুমোদন দেয় না, এগুলির প্রতি সন্দিহান থাকে। প্রাচীন সমাজে সংখ্যালঘু মানুষের এই সন্দেহ আন্দোলনে পরিণত হওয়ার সুযোগ পেত না বললেই চলে, কারণ পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের (Experimental science) বিকাশ না ঘটার দরুন কোন রীতিনীতি বা বিশ্বাসকে প্রমাণ বা অপ্রমাণ— কোনটা করাই সম্ভব হতো না। বিপরীতে আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিকাশ শুরু হওয়ার পর এই সুযোগ ক্রমশ প্রসারিত হয়েছে এবং সন্দেহ কখনো কখনো আন্দোলনে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু কায়েমি স্বার্থবাহীরা সংখ্যাগুরু মানুষের সহজ ও অকপট বিশ্বাসকে মূলধন করে সর্বদাই এই আন্দোলনকে আক্রমণ করে থাকে, এবং আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিদের নানাভাবে হেনস্থা করে। উদাহরণের অভাব নেই। আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির যুগ শুরু হতেই জিওদার্নো ব্রুনোকে খ্রিস্টান পাদ্রিরা জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করেছিল, পোপের নির্দেশে গ্যালিলিওকে আজীবন কারাবাস ভোগ করতে হয়েছিল। ডারউইনকে বিচার করতে না পারলেও ইংল্যান্ডের আর্চবিশপ উইলবারফোর্স নানাভাবে তাঁকে অপদস্থ করার চক্রান্ত থেকে কখনও ক্ষান্ত হয়নি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে অনেক প্রমিথিউসকেই কায়েমি স্বার্থবাহীদের অত্যাচার ও চক্রান্তের শিকার হতে হয়েছে। এই পরম্পরায় অতি সাম্প্রতিক সংযোজন নরেন্দ্র দাভোলকার।

নরেন্দ্র দাভোলকার ছিলেন মহারাষ্ট্রের 'অন্ধ শ্রদ্ধা নির্মূলন সমিতি'-এর প্রতিষ্ঠাতা, কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট কর্মী ও নেতা। জ্যোতিষী, ওঝা ও বিভিন্ন গুরুবাদীদের কালো যাদু (Black magic) এবং তথাকথিত অলৌকিক চিকিৎসা ও কার্যাবলীর বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তিনি। আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে তিনি কুসংস্কার বিরোধী একটি আইনের খসরা (বিল) মহারাষ্ট্র সরকারের নিকট পেশ করেছিলেন। বিলটিকে আইনে পরিণত করার জন্য গত তিন-চার বছর ধরে তিনি এবং তার সহকর্মীরা লাগাতার আন্দোলনে রত ছিলেন। বিলটি ক্যাবিনেট দ্বারা অনুমোদিত হলেও অদৃশ্য কোনো কারণে মহারাষ্ট্র সরকার তা বিধানসভায় কখনও পেশ করেনি।

নরেন্দ্র দাভোলকারদের এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে কায়েমি স্বার্থবাহী চক্রের প্রধান মুখ হিসেবে প্রকাশ্যে কাজ করত 'সনাতন সংস্থা' নামে একটি হিন্দু মৌলবাদী সংগঠন। 'সনাতন সংস্থা' দীর্ঘকাল ধরেই দাভোলকার এবং তার এক সহকর্মী শ্যাম মানবকে হুমকি দিয়ে আসছিল। খুন হওয়ার আগে দাভোলকার দুজন স্বঘোষিত 'গডম্যানের' অর্থাগমের উৎস নিয়ে তদন্ত করছিলেন। এই 'গডম্যান'রাও তাঁকে নানাভাবে হুমকি দিয়েছিল। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরঙ দলও নিরীশ্বরবাদীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে শাস্তির হুমকি দিয়েছে। এই হুমকির লক্ষ্য ছিল দাভোলকার, শ্যাম মানব, কুমার কেট্‌কার এবং দিলীপ ওয়াগলে প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। দাভোলকাররা কালো যাদুর বিরুদ্ধে জনমত গঠনের কাজ করতেন 'সাধনা' পত্রিকার মাধ্যমে। আর 'সনাতন সংস্থা' তাদের মুখপত্র 'সনাতন প্রভাত'-এর মাধ্যমে দাভোলকারদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অপপ্রচার চালাত। এই বৈরিতার মধ্যে গত ২০শে আগস্ট, ২০১৩ সকালবেলা নরেন্দ্র দাভোলকার খুন হন। পুলিশ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী, দাভোলকারের কোনো ব্যক্তিগত বা পারিবারিক শত্রু ছিল না। অতএব খুনীরা যে হিন্দু মৌলবাদীদের দ্বারা নিয়োজিত সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ নেই। খুনীদের চিহ্নিতকরণ ও গ্রেপ্তারের উদ্দেশে তদন্ত প্রক্রিয়ার ফলাফল এখনও পর্যন্ত শূন্য।

ভবিষ্যতে দাভোলকারের খুনীরা ধরা পড়বে কিনা বা এই খুনের নেপথ্যের প্রকৃত তথ্য জানা যাবে কিনা— এই প্রশ্নের সাথে এই মুহূর্তে কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলনকে ঘিরেও অনেক প্রশ্ন আমাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রশ্নগুলো যে

শুধু মহারাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতেই প্রাসঙ্গিক তা নয়, সারা দেশেই প্রাসঙ্গিক। ভারতের সব প্রদেশেই কালো যাদু, জাতপাত ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি এখনও যথেষ্ট প্রভাবশালী এবং প্রত্যেক প্রদেশেই এসব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন কমবেশি বিদ্যমান। পশ্চিমবঙ্গেও কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনের ঐতিহ্য গৌরবময় এবং এখনও এ আন্দোলনে ভাটা পড়েনি।

কুসংস্কার : কেন, কোথায়?

সমাজে প্রচলিত যেসব বিশ্বাস, রীতিনীতি ও ধারণার অনুশীলন অবৈজ্ঞানিক তাদেরকে আমরা কুসংস্কার বলে থাকি। আবার প্রচলিত প্রতিটি বিশ্বাস, রীতিনীতি ও ধারণার কিছু না কিছু সামাজিক ভিত্তি এবং সেই সূত্রে কিছু প্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্যও আছে। এটা থাকার জন্যই এগুলি যুগ যুগ ধরে সমাজে টিকে আছে।

কুসংস্কারের সামাজিক ভিত্তি বলতে আমরা এমন কিছু বিষয়কে বুঝি যে কারণে সমাজে কোন কুসংস্কারের আবির্ভাব ঘটে থাকে এবং তার আপাত-প্রয়োজনীয়তা নিছক ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নয়, বরং চরিত্রগতভাবে সামাজিক। বিষয়টাকে আমরা সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসে খুঁজে দেখবার চেষ্টা করব।

সামাজিক উৎপাদন মানেই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, যা একই সাথে সামাজিক উৎপাদনকে ঘিরে পারস্পরিক **সহযোগিতা ও** দ্বন্দ্ব, ব্যক্তির সাথে সমাজের দ্বন্দ্ব এবং নতুন করে প্রকৃতির সাথে মানুষের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব একটি চলমান প্রক্রিয়া, অর্থাৎ একটি দ্বন্দ্বের সমাধান হলে তা থেকে আর একটি দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। ফলত, সামাজিক উৎপাদন প্রকৌশলগুলিও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি, তার ক্রমশ পরিবর্তন ঘটেছে। মানুষের পরিবর্তনশীল অভিযোজন তথা সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার শুরু এখান থেকে এবং আজও তা একইভাবে বাস্তব।

ইতিহাসের কোন বিন্দুতেই উদ্ভূত দ্বন্দ্ব এবং তার সমাধানকল্পে প্রকৌশল বা বস্তুর নিয়ম উদ্ভাবনের মধ্যে সাম্য ছিল না। যে কোন মুহূর্তেই প্রকৌশল বা বস্তুর নিয়ম উদ্ভাবন উদ্ভূত দ্বন্দ্বের অনেক পিছনে পড়ে থাকে। তবে সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার সূচনাকালে পরিস্থিতিটা ভিন্ন ছিল। শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী কালে মানুষের সচেতন প্রয়াসের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। প্রকৃতি-পরিবেশের সাথে উদ্ভূত মানুষের কোন দ্বন্দ্বের সমাধান যতক্ষণ পর্যন্ত পরীক্ষামূলকভাবে সম্ভব না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজ তার জন্য অপেক্ষমান থাকতে পারে। কিন্তু সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার সূচনা থেকে শিল্পবিপ্লবের পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত মানুষের সচেতন প্রয়াস এই সুরে বাধা ছিল না, কারণ এই সময়পর্ব জুড়ে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের (experimental science) পর্যাপ্ত বিকাশ ঘটেনি। এজন্য এই সময়পর্বে উদ্ভূত দ্বন্দ্বের সমাধান হিসেবে যেসব প্রকৌশল বা নিয়মের উদ্ভাবন হত, পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের প্রমাণ বা অপ্রমাণ কোনটা করারই সুযোগ ছিল না। এইসব প্রকৌশল বা নিয়মের অধিকাংশই আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি তথা পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের নিরিখে অপ্রমাণিত এবং মানুষ ও সমাজের পক্ষে বিভিন্নভাবে ক্ষতিকর। এইসব প্রকৌশল ও নিয়মগুলিকে আমরা কুসংস্কার বলব।

এখানে খুব সঙ্গত কারণেই একটি প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক। কোন নিয়ম বা প্রকৌশল যদি মানুষ ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকরই হয়ে থাকে তাহলে সুদীর্ঘকাল এসব প্রকৌশল ও নিয়ম সমাজে কীভাবে চালু ছিল। অন্তত একটি উদাহরণ সহযোগে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব। ধরা যাক সর্পদংশনের কথা। সর্পদংশনের চিকিৎসা হিসেবে বেশ কিছু নিয়ম ও প্রকৌশল সুদীর্ঘকাল ধরে সমাজে একরকম বাধাহীনভাবে চালু ছিল। এই নিয়ম-প্রকৌশল—সবগুলিই ছিল কালো ম্যাজিক। এদের সাথে সাপের বিষের আদৌ কোন সম্পর্ক ছিল না। আধুনিক জীববিদ্যা, বিষবিদ্যা (Toxicology) ও চিকিৎসাবিদ্যার সূত্রে আমরা জেনে গেছি বিষাক্ত সাপে কামড়ালে এবং দংশিত মানুষের শরীরে মারণ পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি পরিমাণ বিষ প্রবেশ করলে সঠিক চিকিৎসা না হলে আজও যেমন মৃত্যু অনিবার্য অতীতেও তেমনি অনিবার্য ছিল। পার্থক্য একটাই। ১৮৮৫ সালে অ্যান্টি ভেনাম সিরাম আবিষ্কৃত হওয়ার পর এখন এধরনের সর্পদংশিত মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব, অর্থাৎ মৃত্যু অনিবার্য নয়। কিন্তু ১৮৮৫ সালের আগে এধরনের সর্পদংশিত মানুষকে কোনভাবেই বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব ছিল না। এতৎসত্ত্বেও সুদীর্ঘকাল কালো যাদুর টিকে থাকার প্রধান কারণ অবশ্যই এই যে এই প্রকৌশলগুলি সর্পদংশনকে কেন্দ্র করে প্রকৃতির সাথে মানুষের দ্বন্দ্বের একধরনের সমাধান। এগুলি গ্রহণযোগ্য হয়েছিল আরও দুটো কারণে। প্রথমত, সর্পদংশনের একটি অংশ অবিষাক্ত সাপের দংশন। এদের উপরেও কালো যাদুর প্রকৌশলগুলি প্রয়োগ করা হত এবং তাদের বেঁচে যাওয়ার কৃতিত্ব বর্তাতো কালো যাদুর উপর। দ্বিতীয়ত, বিষাক্ত সাপের দংশন হলেও মারণ পরিমাণের চাইতে অনেক কম পরিমাণ বিষ শরীরে প্রবেশ করলে মৃত্যু ঘটে না। এর কৃতিত্বও পেত কালো যাদু। আর যে সব ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটত তার দায় চাপান হত 'বিধাতা নির্ধারিত আয়ুষ্কাল'-এর উপর। অতএব সর্পদংশন কেন্দ্রিক কালো যাদু ভিত্তিক 'চিকিৎসা' সুদীর্ঘকাল টিঁকে থাকতে অসুবিধা হয়নি। এভাবেই সমস্ত কালো যাদু তথা কুসংস্কার সুদীর্ঘকাল টিঁকে ছিল, যদিও সবক্ষেত্রে কারণগুলি একই রকম ছিল না।

কুসংস্কারের বিবর্তন ও ধর্ম

শুরুতেই বলে রাখা প্রয়োজন বর্তমান প্রবন্ধে আমরা ধর্ম বলতে বুঝব প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে, যা চরিত্রগতভাবে ইংরেজি শব্দ reli-

gion-এর সমার্থক। অন্যান্য কুসংস্কারের মত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মেরও নেপথ্যে রয়েছে একধরনের দ্বন্দ্বের সমাধান, তবে এ সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব একেবারে শুরুতেই মানব সমাজে আবির্ভূত হয়নি। বিবর্তনের পথে সমাজ অনেক দূর এগিয়ে যাওয়ার পর এসব দ্বন্দ্ব আবির্ভূত হয়েছিল।

সমাজ বিবর্তনের প্রথমদিকে উদ্ভূত দ্বন্দ্বগুলি ছিল অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা ও অস্তিত্বকে অপেক্ষাকৃত সংহত করা অভিমুখীন এবং দ্বন্দ্বের সমাধান হিসেবে কোন নতুন প্রকৌশল বা নিয়মের উদ্ভাবন ঘটত বা পুরানো কোন প্রকৌশল বা নিয়মের নবীকরণ হতো। শুধু প্রকৌশল বা নিয়মের উদ্ভাবন ঘটলেই দ্বন্দ্বের সমাধান হয় না, এদের অনুশীলনকে সমাজে ধারাবাহিকভাবে টিকিয়ে রাখার প্রক্রিয়াও দ্বন্দ্ব-সমাধানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বস্তুত, এই প্রক্রিয়া থেকেই ক্রমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান উৎপত্তি লাভ করে এবং সংশ্লিষ্ট প্রকৌশল প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র অর্জন করে। যেমন সর্পদংশনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশল এবং নিয়মগুলির অনুশীলনকে ধারাবাহিকভাবে টিকিয়ে রাখার কাজটি করে এসেছে একশ্রেণীর মানুষ, যাদেরকে ওঝা বলা হয়। অতএব ওঝা এবং ধারাবাহিক অনুশীলনের প্রক্রিয়াগুলিকে একত্রে বলা হবে সর্পদংশন সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলগুলির প্রতিষ্ঠান। এভাবে অসংখ্য দ্বন্দ্ব, অসংখ্য প্রকৌশল ও অসংখ্য প্রতিষ্ঠান একটি পর্যায়ে সমাজকে সংহত করার পর উদ্ভূত দ্বন্দ্বের চরিত্রে কিছু পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। পূর্বে উদ্ভূত দ্বন্দ্বের অভিমুখ ছিল অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা এবং তাকে সংহত করা। এবার এই দ্বন্দ্বের সাথে যুক্ত হতে শুরু করল অস্তিত্বের উৎস সম্পর্কিত দ্বন্দ্ব। নতুন চরিত্রের এই দ্বন্দ্বের সমাধান প্রক্রিয়া ছিল খুবই জটিল। পূর্বের মত প্রকৌশল উদ্ভাবনের মাধ্যমে এই দ্বন্দ্বের সমাধান সম্ভব ছিল না। অস্তিত্বের উৎস সম্পর্কিত দ্বন্দ্বের সমাধান বস্তুজগতের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের জানা-বোঝার উপর নির্ভর করে। কিন্তু বস্তুজগতের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব জানা-বোঝার জন্যে সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশ যে মাত্রায় প্রয়োজন তা শিল্পবিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীর কোথাও ছিল না। সমাজ বিবর্তনের ঠিক এই অবস্থানে সৃষ্টিতত্ত্ব (creationism) প্রাসঙ্গিক হতে শুরু করে। পৃথিবার যে যে অঞ্চলে সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার উন্মেষ ঘটেছিল তার সর্বত্রই এই প্রক্রিয়ার আবির্ভাব ছিল একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ফলত সব অঞ্চলের সমাজেই কোন না কোন প্রকারে সৃষ্টিতত্ত্ব গড়ে উঠেছিল। অঞ্চলভেদে সৃষ্টিতত্ত্বের প্রকারে বিভিন্নতা ছিল, কিন্তু মৌলিক উপপাদ্যটি সর্বত্র একই এবং তা হল— "এই দেখা, না-দেখা বস্তুজগৎ এবং পৃথিবীর উপর মানুষসহ সমগ্র জীবজগৎ কোন এক অদৃশ্য, অধরা, সর্বশক্তিমান (Almightly) সত্তা দ্বারা সৃষ্ট এবং নিয়ন্ত্রিত এবং সেই সত্তাটি (Entity) এই বস্তুজগৎ নিরপেক্ষ।"

অস্তিত্বের উৎস সম্পর্কিত অসংখ্য দ্বন্দ্বের একটি একীভূত সমাধান এই সৃষ্টিতত্ত্ব। এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপটিও খুব জটিল এবং অনেক ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে তাকে স্থিতিশীলতা (stability) অর্জন করতে হয়েছিল। সৃষ্টিতত্ত্বের কার্যকর অভিমুখ যেহেতু সর্বব্যাপী, সেহেতু মানুষেরও যাবতীয় কাজকর্ম, প্রয়াস ও আন্তঃসম্পর্ক, সবই সেই সর্বশক্তিমান সত্তার নিয়ন্ত্রণের অধীন। অতএব সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার শুরু থেকে উদ্ভাবিত সমস্ত নিয়ম ও প্রকৌশলের প্রতিষ্ঠানগুলিকে যদি সৃষ্টিতত্ত্বের প্রতিষ্ঠানের সাথে এর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে সম্পর্কিত করা না যায় তাহলে সর্বশক্তিমান সত্তার কর্তৃত্বের সমান্তরাল আর একটি কর্তৃত্ব প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে, যা সৃষ্টিতত্ত্বের পরিপন্থী। এটাই ছিল সৃষ্টিতত্ত্বের প্রাতিষ্ঠানিক রূপের জটিলতার প্রধান কারণ। যাইহোক, সব অঞ্চলের সমাজে সমস্ত প্রকৌশল ও নিয়মের প্রতিষ্ঠানগুলিকে ক্রমশ অঙ্গীভূত করে সৃষ্টিতত্ত্বের প্রতিষ্ঠান বিকাশলাভ করতে শুরু করে।

সৃষ্টিতত্ত্বের প্রতিষ্ঠানই কোন কোন সমাজে পরবর্তীকালে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ছোট ছোট সমাজ, যেখানে সামাজিক উৎপাদন প্রকৌশলের বিস্তৃতি খুব স্বল্প পরিসরে বিকাশ লাভ করেছিল, সেখানে সৃষ্টিতত্ত্বের প্রতিষ্ঠান সম্প্রদায়গত সীমার মধ্যে আবদ্ধ থেকে গেছে। এইসব সমাজের অস্তিত্ব বহু অঞ্চলে এখনও রয়েছে। কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্বের মৌলিক উপপাদ্যটি এসব সমাজেও একই রকম।

শিল্পবিপ্লব ও বোধের জগতে নতুন তাড়না

প্রকৌশল উদ্ভাবনের প্রবাহ থেমে থাকেনি। এই প্রকৌশলগুলির মধ্যে সামাজিক উৎপাদন কেন্দ্রিক প্রকৌশলগুলির একটি প্রধান দিক ছিল হাতিয়ার বা টুল। উৎপাদনের নিরিখে এর প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে হাতিয়ার মানুষের শ্রম/প্রয়াসকে বিবর্ধনে সক্ষম। কিন্তু হাতিয়ারের মাধ্যমে উৎপাদনের পরিমাণ ন্যূনতম এবং প্রায় নির্দিষ্ট। টুলের মাধ্যমে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াতে হলে নিয়োজিত কর্মীসংখ্যাও বাড়াতে হবে। ইংল্যান্ড তথা ইউরোপীয় সমাজে শিল্প বিপ্লবের আগে এই সমস্যাটাই উপস্থিত হয়েছিল। রপ্তানির লক্ষ্য মাথায় রেখে বিশেষ কয়েকটি পণ্য (যার মধ্যে সুতি বস্ত্র অন্যতম) উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াতে গিয়ে এত বেশি সংখ্যক মানুষ নিয়োগ করতে হয়েছিল যে অন্যান্য পণ্যের সামাজিক উৎপাদন ও বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় মানুষের সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছিল। শিল্পবিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে এটাই ছিল তৎকালীন ইউরোপীয় সমাজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছিল হাতিয়ার বা টুল থেকে মেশিন বা যন্ত্রে উত্তরণের মধ্য দিয়ে। যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য টুলের উল্টো। যন্ত্র মানুষের শ্রম/প্রয়াসের বহুগুণ বিবর্ধনে সক্ষম।

এটাই শিল্প বিপ্লব। এর তাৎক্ষণিক ফল হলো দুটি। প্রথমত,

বাজারের ব্যাপক সম্প্রসারণ, এবং দ্বিতীয়ত, অভূতপূর্ব প্রতিযোগিতা। আধুনিক পুঁজিবাদের জন্মও এখান থেকে। শুরুতে পুঁজি-প্রভুরা বুঝতে না পারলেও, অচিরেই তারা বুঝতে শিখল যে বাজার-প্রতিযোগিতাকে চলমান রাখার অন্যতম উপায় যন্ত্র-ভিত্তিক প্রযুক্তির (Machine based technology) ক্রম-উত্তরণ অবশ্যম্ভাবী। যার ফলে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির গবেষণার ক্ষেত্রেও একটি মৌলিক পরিবর্তন সূচীত হল। শিল্পবিপ্লবের পূর্বে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নিয়ে যতটুকু ভাবনা-চিন্তা হত তাতে বস্তুজগতের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের প্রভাব ছিল কম। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের পর বাজার-প্রতিযোগিতাকে চলমান রাখার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির গবেষণায় প্রাধান্যকারী ভূমিকায় চলে এল বস্তুজগতের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং এর প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হল পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান (Experimental science)। পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান আজ বহু শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত। বস্তুজগতের অন্দরমহলের অনেক দ্বন্দ্ব ও রহস্য আজ আমাদের জানা হয়ে গেছে। সাথে সাথে অবশ্য অজানার পরিধিও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। অজানার পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ার প্রধান কারণ, এখন আর নিছক কল্পনার মাধ্যমে বা বস্তুনিরপেক্ষভাবে কোন দ্বন্দ্বের সমাধান সম্ভব নয়।

আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও
পুরানো রীতিনীতি, বিশ্বাস ও প্রকৌশল

শিল্পবিপ্লবের আগে বস্তু-নিরপেক্ষ রীতিনীতি, বিশ্বাস ও প্রকৌশলে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করলেও তা আন্দোলনে পৌঁছতে পারত না, কারণ এগুলিকে প্রমাণ বা অপ্রমাণ করার উপযোগী পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের পরিকাঠামো ছিল না। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের পরবর্তীতে এই পরিকাঠামো তৈরি হওয়াতে বস্তু-নিরপেক্ষ রীতিনীতি, বিশ্বাস ও প্রকৌশলসমূহ ক্রমশ অপ্রমাণিত হতে শুরু করল এবং সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির ভিত আলগা হতে শুরু করল। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলি শুরুতে খুব কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এর মোকাবিলা করতে শুরু করেছিল। আগেই বলেছি, ব্রুনোকে খুব তুচ্ছ কারণে খ্রিস্টান ধর্মযাজকরা হত্যা করেছিল। ব্রুনো, কোপার্নিকাস আবিষ্কৃত সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের তত্ত্ব প্রচারে নেমেছিলেন। কিন্তু খ্রিস্টধর্মীয় বিশ্বাস ছিল ভূ-কেন্দ্রিক সৌরজগত। এই বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল এই যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ভূ-কেন্দ্রিক সৌরজগৎ তৈরি করেছেন। আর সেই পৃথিবীতে এনেছেন মানুষকে। টলেমী এটা আবিষ্কার করেছিলেন। সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগৎ বলার অর্থ সর্বশক্তিমানকে চ্যালেঞ্জ জানানো। ব্রুনোর এই চ্যালেঞ্জ পোপ ও পাদ্রিরা মেনে নিতে পারে নি। ডারউইন-এর চেয়ে বেশি অপরাধ করেছিলেন তিনি। সরাসরি সৃষ্টিতত্ত্বের ঝুঁটি ধরে টান মেরেছিলেন। খ্রিস্টান ধর্মযাজকরা খুব ক্ষিপ্ত হলেও ব্রুনোকে যেমন জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিল বা গ্যালিলিওকে আজীবন কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল তেমন কোন শাস্তি তারা ডারউইনকে দিতে পারেনি। এর কারণ অবশ্যই শাসকশ্রেণীর রদবদল।

ব্রুনো থেকে ডারউইন প্রায় আড়াইশো বছরের ব্যবধান। এই সময়ের মধ্যে সামাজিক-উৎপাদন ব্যবস্থার উপর পুরোনো সামন্ত-প্রভুদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিস্থাপন করে পুঁজি তার নিয়ন্ত্রণকে অনেক সংহত করে নিয়েছে। সামন্ত শাসকশ্রেণীর উপর প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের কর্তৃত্ব ছিল এতই প্রবল যে অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তই ছিল শেষ কথা। পুঁজিবাদী শাসকশ্রেণীর উপর এরকম কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারেনি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম। পুঁজি-প্রভুরাও এ জাতীয় কর্তৃত্বের প্রতি আগ্রহী ছিল না তাদের বাজারের স্বার্থে। ডারউইনকে একারণেই গুরুতর শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়নি।

যাই হোক, পরবর্তীকালে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির গবেষণা বস্তুজগৎ ও জীবজগতের নিয়মাবলীকে আরও ব্যাপকভাবে উন্মুক্ত করে দেয়। বস্তু ও মানুষসহ জীবজগতের অস্তিত্ব সংক্রান্ত অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর এখন বিজ্ঞানীদের জানা। কিন্তু এই জানাটা ব্যাপক সংখ্যক মানুষের বোঝায় (understanding) পরিণত হয়নি। এখানেই কুসংস্কার-বিরোধী আন্দোলনের তাৎপর্য। রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য সংগঠন কোনদিনই এই আন্দোলনের সহায়ক ছিল না। শুধু কালো যাদুই নয়, আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টিতত্ত্বও প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংগঠন ও পরিচালকদের আচরণ ও নিয়মনীতিতে বিভিন্ন কুসংস্কার ও সৃষ্টিতত্ত্বের প্রভাব অটুট। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায়ও এর হেরফের নেই। ফলত, বিভিন্ন কুসংস্কার এবং সৃষ্টিতত্ত্বের প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের সক্রিয়তা বজায় রাখতে মরিয়া। পুঁজি তার আগের অবস্থানে নেই। একসময় বাজার সম্প্রসারণের স্বার্থে এবিষয়ে পুঁজি যেটুকু উদার ছিল বর্তমানে তার বিন্দুমাত্র অবশেষ নেই। বরং পুঁজি এখন নিজেই কুসংস্কার ও সৃষ্টিতত্ত্বের প্রতিষ্ঠানগুলিকে সক্রিয় রাখতে উদ্যোগী। নানাবিধ সংকটের মোকাবিলায় পুঁজির এখন প্রয়োজন মানুষকে নানাভাবে বিভক্ত করে রাখা। এই কাজে ধর্ম, কুসংস্কার ও সাম্প্রদায়িকতার মত ধারালো অস্ত্র আর নেই। অতএব কুসংস্কার এবং সৃষ্টিতত্ত্বের প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে পুঁজিও আজ কায়েমি স্বার্থের অন্যতম অংশীদার। নরেন্দ্র দাভোলকারের নৃশংস হত্যাকাণ্ড এটাই আমাদের আবারও বুঝিয়ে দিয়ে গেল। আগামী দিনে যদি কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলনকে আরও জোরদার করতে হয় তাহলে এই আন্দোলনের বিরোধী পুঁজিবাদী এবং সামন্তবাদীদের একই লেন্স দিয়ে দেখতে হবে।

প্রবন্ধ

ভিয়েতনাম-এর মুক্তি যুদ্ধ ও ভো নগুয়েন গিয়াপ

সমরেশ মিত্র

সত্তরের দশকের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী উত্তাল দিনগুলির অবসান, মাওয়ের মৃত্যু, সোভিয়েতের পতন এবং আন্তর্জাতিকতাবাদের পরিবর্তে নানাধরনের সংশোধনবাদ, সংকীর্ণতাবাদ ও আঞ্চলিকতায় সাম্রাজ্যবাদ-আক্রান্ত বিশ্ববাসী আজ দীর্ণ। ভিয়েতনাম ছিল সত্তরের দশকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্তর্জাতিকতার আর এক নাম। তোমার নাম আমার নাম— ভিয়েতনাম। ভিয়েতনাম মুক্তিযুদ্ধের এক প্রধান সৈনিক ভো নগুয়েন গিয়াপ-এর মৃত্যুতে গিয়াপ ও ভিয়েতনাম মুক্তিযুদ্ধের প্রতি এক সশ্রদ্ধ নিবেদন এই লেখাটি।

"ভিয়েতনাম-এর সমস্ত নাগরিক আজ সৈনিক। শহরের সমস্ত মহল্লা আর গ্রামগুলি আমাদের দুর্ভেদ্য দুর্গ। আমাদের গোটা দেশটি এক বিস্তীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র, যেখানে শত্রুরা পরিবেষ্টিত, আক্রান্ত এবং পরাজিত।" - গিয়াপ, ১৯৬১

ভিয়েতনাম-এর মুক্তিযুদ্ধের কিংবদন্তি নায়ক, ভো নগুয়েন গিয়াপ গত ৪ অক্টোবর, ২০১৩, ১০২ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে ভিয়েতনাম মুক্তিযুদ্ধের এক অনন্য বীরগাথার সমাপ্তি ঘটলো।

ভিয়েতনাম-এর অখ্যাত এক গ্রাম, আন ধু-তে ১৯১১-র ২৫ অগাস্ট ভো নগুয়েন গিয়াপের জন্ম হয়। তাঁর বাবা তাঁকে সেই সময়ে ভিয়েতনামের সবচেয়ে সেরা বিদ্যালয়ে পড়তে পাঠান। বিদ্যালয়ে গিয়াপ-এর প্রিয় বিষয় ছিলো ভিয়েতনাম ও ইন্দোচীনের জাতীয়তাবাদী ইতিহাস। বিদ্যালয়ে তাঁর প্রায় সমসাময়িক ছিলেন হো চি মিন এবং ঙ দিন দিয়েম, যিনি পরবর্তীকালে দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন তাঁবেদার পুতুল সরকারের প্রধান হন।

গিয়াপ-এর রাজনৈতিক কাজের হাতেখড়ি ১৩ বছর বয়েসে। ১৯২৪ সালে ভিয়েতনামে ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসকরা যাবতীয় জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। গিয়াপ গোপনে ছাত্রদের রাজনৈতিক কার্যকলাপে উদ্বুদ্ধ করার সময় ধরা পড়েন এবং তাঁকে বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। ছাত্রজীবনের প্রথম দিকে তাঁর পরিচয় ঘটে মার্কসবাদের আকর গ্রন্থসমূহের সঙ্গে এবং তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন।

ধারাবাহিক ভাবে ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই গিয়াপ ভিয়েতনামের মুক্তি নিয়ে সুসংগঠিত প্রচার আন্দোলন গড়ে তুলতে থাকেন। তাঁর বিপ্লবী সাম্যবাদী অনুশীলনের কারণে ফরাসি সরকার এক সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানোর পাশাপাশি তিনি হ্যানয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিদ্যায় ডিগ্রি লাভ করেন এবং একটি বিদ্যালয়ে ইতিহাসের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। তাঁর প্রথম স্ত্রী রাজনৈতিক কাজকর্মের জন্য ফরাসি ঔপনিবেশিক সরকারের হাতে বন্দি হন। বন্দি থাকাকালীন সময়ে তাঁর ওপর অমানুষিক অত্যাচার করা হয়— এই অত্যাচারের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ভিয়েতনামে মুক্তিযুদ্ধের প্রাবল্যে সারা দেশের মানুষ ফরাসি দখলদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ফেটে পড়েন। দক্ষ সংগঠক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেও গিয়াপ কিন্তু কখনই সামরিক প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ পাননি। তিনি স্থির সিদ্ধান্তে আসেন যে ফরাসি ঔপনিবেশিক সরকারকে দেশ থেকে হঠাতে হলে প্রয়োজন প্রশিক্ষিত এক জনগণের সেনাবাহিনীর।

২৮ বছর বয়সের যুবক গিয়াপ ভিয়েতনামে ফিরে আসেন এবং পরবর্তী চার বছর পাহাড়ের গুহায়, গভীর অরণ্যে ডেরা বেঁধে গেরিলা বাহিনী গঠনের কাজ শুরু করেন। গিয়াপ বাহিনীর নেতা হওয়া সত্বেও সকলের সঙ্গে ভাগাভাগি করে কাজ করতেন। সৈনিকদের বিশ্রামের সময় বাড়ানোর জন্য তিনি সকলের হয়ে রান্না করতেন এবং একাই সবাই-এর বাসনপত্র মাজার কাজটি সারতেন। অমানুষিক পরিশ্রম এবং অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় রেখে গিয়াপ তাঁর গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলেন। এই বাহিনী পরবর্তীকালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ত্রাস, *ভিয়েতমিন* বাহিনী নামে পরিচিতি লাভ করে।

ভিয়েতনামের দুর্ভেদ্য অরণ্য আর অগম্য গুহাগুলিতে যে গেরিলা বাহিনী ১৯৪৪ সালে তৈরি হয়, তার প্রথম দিকের সদস্যসংখ্যা ছিল মাত্র ৩৪। কিন্তু এই সাহসী যোদ্ধৃবৃন্দ ভিয়েতনাম-এর স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। হো চি মিন-এর মতো তাঁরাও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে ভিয়েতনামের মানুষ স্বাধীনতার জন্য যাবতীয় আত্মত্যাগে প্রস্তুত।

আগস্ট ১৯৪৫-এ জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আত্মসমর্পণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়। এই শেষ পর্বে ভিয়েতনাম-এর জনগণ ফরাসি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

গিয়াপের অভুক্ত, অপ্রতুল অস্ত্রে সজ্জিত সামান্য সংখ্যার গেরিলা বাহিনীর বিপরীতে ফরাসি সেনাবাহিনীতে ছিল অফুরন্ত অস্ত্রের সৈন্যের জোগান। বিশ্বযুদ্ধে পোড় খাওয়া ফরাসি সমর-নায়করা পরিকল্পনা করেন যে গিয়াপের ছোটো সেনাবাহিনীকে একটি সংকীর্ণস্থানে ফাঁদে ফেলে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। এই

পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য ফরাসি সেনাবাহিনী *দিয়েন বিয়েন ফু* নামক একটি গ্রাম এবং সংলগ্ন অঞ্চল অতর্কিতে আক্রমণ করে দখল করে এলাকাটিকে কার্যত একটি সুসজ্জিত দুর্গে পরিণত করে। অনেকগুলি সামরিক ছাউনি, নজরদারির স্থান প্রতিষ্ঠা করা হয়। যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত এবং পারদর্শী প্রায় ১৪,০০০ সৈন্য একজন অভিজ্ঞ ফরাসি সেনাপতির অধীনে মোতায়েন করা হয়।

গেরিলাযুদ্ধে দক্ষ গিয়াপ ফরাসিদের এই পরিকল্পনার কথা অনুমান করে তিনি তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনার মাধ্যমে ফরাসিদের ভিয়েতনাম থেকে উচ্ছেদ করার রাস্তা গ্রহণ করেন। গিয়াপের নেতৃত্বে সেনানী সহ যুদ্ধে পটু প্রায় ৫০,০০০ সশস্ত্র ভিয়েতনামীদের তিনি নিকটবর্তী পাহাড়ে মেশিনগান এবং বোমা-বহনকারী রকেট স্থাপন করেন। গেরিলাদের অতর্কিত তীব্র আক্রমণে *দিয়েন বিয়েন ফু*-র ফরাসি সামরিক বিমানবন্দর দুটি বিধ্বস্ত হয়ে যায়। বিমানবাহিনী সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়ে। ফরাসি সেনাবাহিনীকে অন্তরালে অবস্থান করে, দূরবর্তী স্থান থেকে আধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করে যুদ্ধ জয় করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। বস্তুত, এটাই ছিলো যে কোনো যুদ্ধে ফরাসি সৈন্যবাহিনীর আপেক্ষিক সুবিধার দিক। গিয়াপ ফরাসি সেনাবাহিনীর এই সুবিধার বিষয়ে সম্যকভাবে অবহিত ছিলেন।

তিনি পরিকল্পনা করেন যে গেরিলারা ফরাসি সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সরাসরি সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হবে। এই পরিকল্পনা রূপায়িত করার জন্য গিয়াপের নেতৃত্বে এবং তত্ত্বাবধানে নিকটবর্তী পাহাড়গুলি থেকে ফরাসি সেনা-ছাউনিগুলি পর্যন্ত দীর্ঘ সুড়ঙ্গ খনন করা হয়। সুড়ঙ্গ-বাহিত হয়ে ভিয়েতনামের গেরিলারা ফরাসি সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হয়। ফরাসি সেনাবাহিনী কার্যত গেরিলাদের দ্বারা ঘেরাও-অবরোধের মধ্যে পড়ে যায়।

দুমাস ধরে এই অবরোধ চলে। এই অবরোধে ১০,০০০ গেরিলা প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেন। তাঁদের সাহায্য করার জন্য আরও এক লক্ষ শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-নারী স্বেচ্ছাসেবক যোগ দেন। এই স্বেচ্ছাসেবকরা কখনও সাইকেলে, কখনও বা নিজেদের পিঠে করে খাদ্য, অস্ত্রের যন্ত্রাংশ ইত্যাদি বহন করে বিভিন্ন সুড়ঙ্গ-র মুখে পৌঁছে দিয়ে রসদের জোগান অব্যাহত রাখতেন। সৈন্যসহ সমগ্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে গিয়াপ সংগঠিত করেন। *দিয়েন বিয়েন ফু*-র অবরোধ চলাকালীন সময়ে ইন্দোচীনের স্বাধীনতা লাভের সমস্যা নিয়ে জেনেভা শহরে ফরাসি এবং ভিয়েতনাম-এর প্রতিনিধিদের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক চলছিল। ১৯৫০-এর ৭ মে, সেই বৈঠকের চূড়ান্ত দিন ঘোষিত হয়। গিয়াপ ঠিক সেই দিন তাঁর শেষ আঘাত হেনে *দিয়েন বিয়েন ফু*-কে ফরাসিদের দখলমুক্ত করেন এবং ১১০০০ হাজার ফরাসি সৈন্যকে বন্দি করেন। যুদ্ধবন্দি হওয়ার ভয়ে ভীত হয়ে ফরাসি কর্নেল চার্লস পিরোথ নিজের গায়ে গ্রেনেড ছুঁড়ে আত্মহত্যা করেন।

ভিয়েতনাম-এ ফরাসিদের এই শোচনীয় পরাজয়ের প্রেক্ষিতে ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসকরা শেষ পর্যন্ত ইন্দোচীন থেকে হাত গোটানোর সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে ঘোষণা করে।

ইতিমধ্যে ব্রিটেন ভারতে ক্ষমতা দখলে উৎসাহী দুটি বিবদমান গোষ্ঠীর হাতে দেশটিকে দুভাগ করে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে দেশটিতে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখার মডেলটি সফলভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়। সেই মডেলটিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ফ্রান্সও ভিয়েতনামকে দুখণ্ড করে দক্ষিণ ভিয়েতনামে একটি তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভিয়েতনাম থেকে প্রস্থান করে। উত্তর ভিয়েতনাম-এ হো চি মিন-এর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয়।

এপ্রিল ১৯৫৬তে শেষ ফরাসি সৈন্যটি ভিয়েতনাম থেকে পাততাড়ি গোটালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে। শর্ত ছিল, ফ্রান্স ভিয়েতনাম ছেড়ে চলে গেলে একটি সার্বিক গণভোট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দুই ভিয়েতনামের একীকরণের বিষয়টি হাতে নেওয়া হবে। কিন্তু মার্কিন দেশ এই প্রস্তাবের বিরোধিতায় প্রথম থেকেই কোমর বাঁধে। এই গণভোট প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করার জন্য পেন্টাগন প্রথমে দক্ষিণ ভিয়েতনামে ''পরামর্শদাতা'' নিয়োগ করে। পরে যখন দিয়েম এবং পরবর্তী সময়ে থিউ সরকার জনপ্রিয়তা হারিয়ে দেশ শাসনে চূড়ান্ত অপদার্থতার পরিচয় রাখে, তখন ১৯৬৫ সালে মার্কিন দেশ দক্ষিণ ভিয়েতনামে সরাসরি মার্কিন সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন সেনার সংখ্যা বাড়তে থাকে। মার্কিন বিমানবহর এমনকি উত্তর ভিয়েতনামের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করে। সে দেশে যথেচ্ছ নাপাম বোমা ছাড়াও এজেন্ট অরেঞ্জ নামক রাসায়নিক ছড়িয়ে জেনেভা-চুক্তি মতে বেআইনি রাসায়নিক যুদ্ধ শুরু করে দেয়। উত্তর ভিয়েতনামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এই কারণে আজও চাষের অযোগ্য। *মাই লাই* গণহত্যা সহ আরও অনেক অমানবিক হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করেও উত্তর ভিয়েতনামকে মার্কিন দেশ দখল করতে ব্যর্থ হয়।

গিয়াপের নেতৃত্বে গেরিলাবাহিনী ১৯৬৮ সাল থেকে আবার মার্কিন হানাদারদের বিরুদ্ধে জনযুদ্ধ শুরু করে। এই বছর বাসন্তিকার নতুন বর্ষে গিয়াপের নেতৃত্বে একটি বিশাল আক্রমণের পরিকল্পনা নেওয়া হয় যা ভিয়েতনাম মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ''টেট আক্রমণাত্মক যুদ্ধ'' হিসেবে খ্যাত। এই যুদ্ধে বহু মার্কিন সেনাঘাঁটি একযোগে আক্রান্ত হয়, দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজধানী সায়গনে অত্যন্ত সুরক্ষিত মার্কিন দূতাবাসে আক্রমণ ঘটে।

এই যুদ্ধে দু'পক্ষের প্রবল ক্ষয়ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও *ভিয়েতমিন*

গেরিলা বাহিনীর দক্ষতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ঘটনার পর ভিয়েতনামে মার্কিন নৃশংসতার বিরুদ্ধে বিশ্ববিবেক তথা মার্কিন দেশের বেশ কিছু নাগরিক বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিখ্যাত গায়িকা জোয়ান বায়েজ ভিয়েতনাম লিবারেশন রেডিও থেকে মার্কিন নাগরিদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা ক্যাসিয়াস ক্লে ওরফে মহম্মদ আলি ভিয়েতনাম যুদ্ধে বাধ্যতামূলকভাবে সৈনিক হওয়ার আইনি বাধ্যতা প্রত্যাখ্যান করে হাজতবাস করেন। ঘরে-বাইরে চাপের মুখে পড়ে মার্কিন দেশ ভিয়েতনাম থেকে সরে আসার কথার ঘোষণা করলেও তারা উত্তর ভিয়েতনামে বিমানহানা অব্যাহত রাখে।

গেরিলাযুদ্ধ চলতেই থাকে। শেষ পর্যন্ত গিয়াপের নেতৃত্বে গেরিলা বাহিনী ১৯৭৫ সালের ৩০ এপ্রিল মার্কিন তাঁবেদার দক্ষিণ ভিয়েতনাম-এর পুতুল সরকারকে পরাজিত করে রাজধানী সায়গন দখল করে নেয়। দুই ভিয়েতনাম আবার ঐক্যবদ্ধ হয় এবং গিয়াপ নতুন সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৭৬ পর্যন্ত তিনি এই পদে আসীন ছিলেন। এপ্রিল ১৯৮১ থেকে ডিসেম্বর ১৯৮৬ তিনি মন্ত্রীগোষ্ঠীর উপসভাপতি ছিলেন।

সোভিয়েত-চীন মতাদর্শগত বিতর্কের সময় ভিয়েতনাম সঙ্গত কারণেই প্রত্যক্ষভাবে কোনও শিবিরে যোগ দেয়নি। এই বিতর্ক, সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পূর্বে সে দেশে গর্বাচভের উত্থান, চীনে তেং শিয়াও পিং-এর নানান নীতির ফলে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে যে বিভ্রান্তি দেখা দেয়, ভিয়েতনামও সেই আগুনের আঁচ থেকে রেহাই পায়নি। ইয়েনান পাড়ি দেওয়া গেরিলা যুদ্ধের নায়ক গিয়াপ, প্রতিবেশী রাজ্য কাম্পুচিয়া (পূর্বতন কাম্বোডিয়া) তথা সমগ্র ইন্দোচীনের মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় সমর্থক গিয়াপ এক সময়ে কাম্পুচিয়ার সীমান্ত লঙ্ঘন করে সে দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে দ্বিধা করেননি। যে চীন এক সময় ভিয়েতনাম যুদ্ধে গেরিলাদের সবচেয়ে কাছের বন্ধু ছিল এবং যাদের সাহায্য সর্বদা ভিয়েতনামের গেরিলাবাহিনী মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করত, এক সময় সেই মাও-পরবর্তী চীন এবং হো চি মিন পরবর্তী ভিয়েতনাম পরস্পরের সঙ্গে সীমান্ত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই সীমান্ত যুদ্ধে চীনের বিপক্ষে ভিয়েতনামের সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব ছিলেন জেনারেল ভো-নগুয়েন গিয়াপ।

গর্বাচভ-পরবর্তী রাশিয়ার মতো না হলেও ভিয়েতনাম তার পূর্বের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকা ক্রমাগত পেছনে ঠেলে দিতে থাকে। এক সময় গিয়াপ-এর পরিচিতি গড়ে ওঠে বরিষ্ঠ রাষ্ট্রনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে, তাঁর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকায় কথা পেছনে চলে যায়। গিয়াপ-এর সক্রিয় অংশগ্রহণে ১৯৯৫ সালে ভিয়েতনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যাবতীয় অত্যাচারের কথা ভুলে গিয়ে তার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। মার্কিন দেশ ভিয়েতনামের জনগণের কাছে তার অতীত ভূমিকার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করুক, সারা দেশ জুড়ে এমন দাবি থাকা সত্ত্বেও ভিয়েতনাম রাষ্ট্রস্তরে কখনও এই দাবিটি উত্থাপন করেনি। অবিভক্ত ভিয়েতনামে পুনরায় পূর্বতন দক্ষিণ ভিয়েতনামের আদলে মার্কিন অপকৃষ্টি, মার্কিন লগ্নি এবং বেসরকারিকরণ শুরু হয়ে যায়। বর্তমানে ভিয়েতনাম তার অর্থনীতি কোরিয়া, হংকং, সিঙ্গাপুর এবং বকলমে মার্কিন দেশের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে। পূর্বের উত্তর ভিয়েতনাম-এ যে সব নাগরিক সুরক্ষা ছিল, রাষ্ট্র যেমনভাবে কৃষক জনতার পক্ষে দাঁড়াত তা ক্রমে ক্রমে প্রত্যাহৃত হচ্ছে। ২০২০-এর পর ভিয়েতনামে 'পূর্ণ উদারিকরণ' সম্পূর্ণ হবে বলে মার্কিন দেশ 'আশাবাদী'।

১৯৮৭-র পর ভিয়েতনামে কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের স্বপক্ষে আইন চালু করা হয়। তারপর থেকেই সে দেশে রপ্তানির উদ্দেশে ক্রমাগত প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ছে। ১৯৭৬-এর সাপেক্ষে শ্রমিকদের আসল মজুরি কমতির দিকে।

পরিণত বয়সে গিয়াপ ভিয়েতনাম-এর এই পালাবদলের বিষয়টি সমর্থন করেছেন। কিন্তু ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের ক্রমাগত অধঃপতন ও পশ্চিমী কৃষ্টির প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে নব্য প্রজন্মের কাছে পরাজিত হয়ে গিয়াপ একসময় প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর নিতে বাধ্য হন।

মৃত্যুর আগে তিনি ভিয়েতনামে পরিবেশ-বিপর্যয়কারী চীনা সহায়তায় একটি বক্সাইট খনির বিরুদ্ধে সরব হন। তিনি এই পরিবেশ আন্দোলন সমর্থন করায় তৎকালীন ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী ঐ প্রকল্পটি পুনর্বিবেচনার আশ্বাস দেন। প্রকল্পটি গিয়াপের জীবদ্দশাতেই প্রায় চালু হওয়ার মুখে, তার বিরুদ্ধে গিয়াপ কোনো সদর্থক ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হন।

গিয়াপ-এর মূল্যায়ন করতে বসে গিয়াপের শত্রুপক্ষ তাঁর সম্পর্কে কী মূল্যায়ন করেছেন, তা দিয়ে শেষ করি। পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিয়েতনাম-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক উইলিয়াম ডুইকার গিয়াপের মৃত্যুর পর নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছেন :

> গিয়াপের মুখ্য উত্তরাধিকার রয়ে গেছে ফরাসী এবং মার্কিন দেশের বিরুদ্ধে তাঁর জনযুদ্ধের অনুশীলনের মধ্যে। তিনি বাস্তব অনুশীলন থেকে বিশ্ববাসীকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন যে সামরিক দিক থেকে একটি ক্ষীণবল, পশ্চাৎপদ দেশ কেমনভাবে কেবলমাত্র তীক্ষ্ণ সামরিক প্রজ্ঞা এবং সঠিক রাজনীতিতে বলীয়ান হয়ে একটি সবল, প্রবলভাবে আধুনিক সৈন্যদলকে সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত করতে পারে।

এই কারণেই হয়তো শেষ জীবনের তাঁর নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিশ্বের সংগ্রামী জনগণ গিয়াপকে স্মরণ করবেন।

গিয়াপ ও ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ

আগে ইন্দোচীন বলতে বোঝানো হতো বর্তমানে সাংহাই থেকে লোহিত নদীর বদ্বীপ এবং মেকং নদীর বদ্বীপ পর্যন্ত অঞ্চল। ভিয়েতনাম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইন্দোচীন উপকূলে সবচেয়ে পূব দিকের দেশ। এই দেশের পূবের সীমানায় রয়েছে দক্ষিণ চীন সাগর, উত্তরে চীন দেশ, উত্তর-পশ্চিমে লাওস এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে কাম্পুচিয়া বা কাম্বোডিয়া।

আয়তনের দিক থেকে দেশটি নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে তুলনীয়। ষোড়শ শতাব্দীতে ভিয়েতনামের মতো প্রাকৃতিক এবং মানবসম্পদে ভরপুর দেশটিতে ইউরোপীয় হানাদারদের নজর পড়ে। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো চীনকে লুঠ করার যে উৎসবে মেতে উঠেছিল, সেই উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য ফ্রান্স, চীনে পৌঁছনোর নতুন রাস্তা খোঁজ করতে গিয়ে ১৮৫৮-তে ভিয়েতনামে দস্তা এবং তামার খনির সন্ধান পায়। গ্রামীণ ভিয়েতনামীদের প্রায় দাস-শ্রমিকে পর্যবসিত করে ফ্রান্স শেষ পর্যন্ত ভিয়েতনামে আর্থিক শোষণ তীব্রতর করার অভিপ্রায়ে ১৮৯০ সালে ভিয়েতনামকে ফরাসী উপনিবেশে পরিণত করে।

ফ্রান্সের এই জবরদখলের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। বারেবারে বিদ্রোহ ঘটে, কিন্তু ফ্রান্সের দখলদারি বজায় থাকে। হো চি মিন ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন এবং ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ফ্রান্স নাৎসি জার্মানির কাছে হার মানে। ফ্রান্সের *ভিচি* সরকার জার্মানির বিরুদ্ধে কোনো সংগ্রাম সংগঠিত না করে দেশ ছেড়ে পালায়, কিন্তু উপনিবেশ ভিয়েতনামের ওপর তাদের দখলদারি বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির মিত্র রাষ্ট্র জাপান এক সময়ে ইন্দোচীনে প্রবেশ করে বিপক্ষ রাষ্ট্রের সৈন্যদের হটিয়ে দেয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে একটি সাধারণ সমঝোতা থাকে। তাই যুদ্ধে জাপান পরাজিত দেশ ফ্রান্সকে ভিয়েতনামের ওপর তার কর্তৃত্ব বজায় রাখতে অনুমতি দেয়। ১৯৪৫-এর মার্চে জাপান ভিয়েতনামের ফরাসি সরকারকে উৎখাত করে এবং ভিয়েতনামের প্রাচীন রাজবংশের একজনকে খাড়া করে বকলমে ভিয়েতনামে জাপানী শাসন কায়েম করার চেষ্টা চালায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন জার্মানি দ্বারা সোভিয়েত রাশিয়া আক্রান্ত হয়, তখন হো চি মিন ভিয়েতনাম ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ গঠন করেন, যার স্থানীয় নাম *ভিয়েতমিন*। এই লিগে কমিউনিস্ট থেকে জাতীয়তাবাদী, সবাই একজোট হয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে।

১৯৪৫-এর আগস্টে জাপান আত্মসমর্পণ করে এবং হো চি মিনের নেতৃত্বে *ভিয়েতমিনরা* হানাদার বাহিনী বিরোধী যুদ্ধ শুরু করে। ভিয়েতমিনদের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী ছিল। আগস্ট মাসের এই যুদ্ধে, ভিয়েতমিন সেনাবাহিনী হো চি মিন ও গিয়াপের নেতৃত্বে পুতুল সরকারকে বিতাড়ন করে এবং হো চি মিন গণ-প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনাম গঠনের কথা ঘোষণা করেন। ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এই যুদ্ধ আগস্ট বিপ্লব নাম পরিচিত।

বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীকে মার্কিন দেশ নিজের কব্জায় আনার জন্যে ভিয়েতনামের দক্ষিণ অংশে একটি তাঁবেদার সরকার গঠন করে। যারা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছিলেন, সেই ভিয়েতমিন সব ধরনের বিদেশি শাসন, আগ্রাসন এবং দখলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। মাও-এর চীন ভিয়েতমিনদের অস্ত্র ও অন্যান্য সাহায্য দেওয়া শুরু করে। উত্তর ভিয়েতনামে হো চি মিন-এর নেতৃত্বে কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখল করে।

দক্ষিণ ভিয়েতনাম অংশের ভিয়েতমিন দেশপ্রেমিকরা তাঁবেদার সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রাম এবং একটি সংযুক্ত স্বাধীন ভিয়েতনাম গঠনের জন্য দক্ষিণ ভিয়েতনামে 'লিবারেশন ফ্রন্ট' গড়ে ওঠে। এই ফ্রন্টের সামরিক গেরিলা বাহিনী পরবর্তী কালে *ভিয়েতকং* নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।

দুই ভিয়েতনাম একযোগে মার্কিন দখলদারির বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে থাকে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র লাওস ও কাম্বোডিয়ার ভিতর দিয়ে উত্তর ভিয়েতনাম, দক্ষিণ ভিয়েতনামে সামরিক সাহায্য পাঠাতে থাকে।

ভিয়েতনাম মুক্তিযুদ্ধের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দুনিয়ার সংগ্রামী জনগণ আজও স্মরণ করেন। প্রথমত এই মুক্তিযুদ্ধ বিজয় অর্জন করেছে সংগ্রামের মূল নেতা হো চি মিন-এর মৃত্যুর পর। দ্বিতীয়ত, এই সংগ্রাম সার্থক যুক্তফ্রন্ট গঠনের ফলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় যে সম্ভব, তা প্রমাণ করে। তৃতীয়ত, চীন-সোভিয়েত আন্তর্জাতিক মহাবিতর্ক যেখানে সারা পৃথিবীর কমিউনিস্ট আন্দোলনে ভাঙ্গন এনেছে, সেখানে ভিয়েতনামর কমিউনিস্টরা এই বিতর্ক ধারণ করে আন্দোলনে বিভাজন রোধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মুক্তি আন্দোলনের ফলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পরাজিত এবং অপদস্থ হয়ে, সৈন্যবাহিনীকে পরিত্যাগ করে পালিয়ে গেছে। এমন ঘটনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আর ঘটেনি। ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ প্রমাণ করেছে, প্রতিবিপ্লবকে স্তব্ধ করতে অস্ত্রের ভূমিকা প্রধান নয়, জনশক্তিই নিয়ামক ভূমিকা পালন করে।

প্রবন্ধ

রাজনৈতিক বন্দি : ভারত

বিশ্বজিৎ রায়

আপনাকে শুধু এটুকুই করতে হতো, এক মুহূর্তের জন্য আপনি আপনার চির অভ্রান্তির দম্ভ যা কিনা অন্যান্য দেবতাদেরও আছে..., তা ত্যাগ করা। এতো রীতিমতো রাজদ্রোহমূলক কথাবার্তা... হতে পারে, কিন্তু আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি, যদি আমি দেবতা হতাম, প্রতিদিন এ কথাই বলতাম— আশীর্বাদধন্য তাঁরাই যাঁরা রাজদ্রোহের পথ বেছেছেন, কেননা পৃথিবীর রাজত্ব তাঁদেরই...। (ঈশ্বরের প্রতি কেইন (আদম-ইভের প্রথম সন্তান), হোসে সারামাগোর উপন্যাস 'কেইন')

কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, মণিপুর থেকে মহারাষ্ট্র — নানা রাজনৈতিক, সামাজিক আন্দোলন-সংগঠন এবং নাগরিক সমাজের অংশীদার হাজার হাজার মানুষ আসমুদ্র হিমাচল শতেক কারাগারে বন্দি। কিন্তু ভারত-ভাগ্যবিধাতাদের অভিধানে রাজনৈতিক বন্দি বলে কোনও শব্দবন্ধ নেই। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের বার্ষিক রিপোর্ট, জাতীয় 'প্রিজন স্ট্যাটিসটিকস', জাতীয় অপরাধ তথ্য-পরিসংখ্যান কেন্দ্র (ব্যুরো) মায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন— কোথাও বিচারাধীন ও সাজাপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দিদের উল্লেখ পর্যন্ত নেই। কারণ দেশের সংবিধান এবং আইন রাজনৈতিক অপরাধ এবং তার দমনে শাস্তিস্বরূপ কারাবাসের বিধানের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। এ এক কাফকা-বর্ণিত নীরবতার ক্ষমতাতন্ত্র যা আইনের শাসন ও আইনের চোখে সমানাধিকারের বুকনির আড়ালে বিদ্যমান শাসনব্যবস্থার সমালোচকদের অস্তিত্ব এবং ন্যায্যতাকে অস্বীকার করে। এমনকি রাষ্ট্রবিরোধী নয়, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির শাসকদলগুলির বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির বন্দি কর্মী-সমর্থকদের এবং নাগরিক সমাজের সদস্যদের ক্ষেত্রেও রাজবন্দির তকমা জোটানো মুস্কিল। যদিও ঔপনিবেশিক কারাব্যবস্থায় রাজনৈতিক কারণে বন্দিদের বিশেষ মর্যাদাদানের ব্যবস্থা ছিল, যা স্বাধীনতা সংগ্রামের নানা ধারার সুদীর্ঘ আন্দোলনের ফসল। কিন্তু উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের অভিভাবকদের চোখে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের মধ্যরাত্রিতে সেই ইতিহাসের ছেদ ঘটে গেছে। জনগণের সার্বভৌমত্বের নামে সংসদীয় গণতন্ত্রের বকলমে রাষ্ট্র-বিরোধিতার অধিকার, যা আসলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষমতাসীন শাসকবৃন্দ এবং তাদের বশংবদ পুলিশ-মিলিটারী-প্রশাসনের বিরোধিতার অধিকার— তার ঐতিহাসিক ন্যায্যতা এবং ধারাবাহিকতা আজ ভয়ংকরভাবে আক্রান্ত। রাষ্ট্র-বিরোধিতা এবং সরকার-শাসকদল বিরোধিতায় পার্থক্য কিছুই নেই। সরকার দেশ-জাতি-রাষ্ট্র সমার্থক। রাজনৈতিক বন্দি বিষয়ে পরিব্যাপ্ত রাষ্ট্রীয় নীরবতা এবং অস্বীকারের সর্বগ্রাসী প্রশাসনিক আয়োজনের বিংশ শতকীয় উদাহরণ হিসাবে স্তালিন-জমানার গুলাগ-শ্রমশিবির, মানসিক রোগীদের হাসপাতাল ইত্যাদির লেভিয়াথন সঙ্গত কারণেই ধিকৃত ও নিন্দিত। কিন্তু গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী, অহিংসার পূজারীদের পুলিশ-রাষ্ট্রে আজ এক অদ্ভুত আঁধার। উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতে ফিরে এলে ক্ষুদিরাম-ভগৎসিংহ-আসফাকউল্লা বা বীরসা-তিলকা-সিদো-কানহুরা দেখতে পেতেন তাঁদের উত্তরসূরীরা স্বাধীন দেশের জেলে জেলে বন্দি ইংরেজের আইনেই— রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে। কিন্তু রাজদ্রোহীর মর্যাদা তারা পান না। বিনা বিচারে অথবা বিচারের নামে দীর্ঘস্থায়ী প্রহসনের জেরে বছরের পর বছর জেলে পচে মরাই তাঁদের নিয়তি আজও।

উল্টে ৯/১১-র পর ঔপনিবেশিক কালের সন্ত্রাস-দমনের ধারাবাহিকতায় যুক্ত হয়েছে মার্কিন আইন এবং দমন-পীড়নের প্রশাসনিক ব্যবস্থার নকলনবিশি। ইংরেজের কালাপানির বদলে এখন মার্কিন গুয়ানতানামো বে। তফাৎ এটাই যে ঔপনিবেশিক 'পেনাল কলোনি' বা দ্বীপান্তরের ব্যবস্থা আজ মার্কিন-জমানায় বহুজাতিক। বিশ্বের যেকোনও প্রান্তে আমেরিকা এবং মিত্রদের 'নিরাপত্তা'র প্রয়োজনে শত্রুদের ড্রোন-হামলায় নিকেশ এবং বশংবদ তৃতীয় বিশ্বের সরকারগুলির সাহায্যে সন্দেহভাজনদের তুলে-আনার ব্যবস্থা এখন জলভাত। ভুবনপাড়ার একমেবাদ্বিতীয়ম মাস্তানের প্রযুক্তি-পেশীবল, জল-স্থল-অন্তরীক্ষে আস্ফালন আজ ঠাণ্ডা-যুদ্ধের পর্বের এলাকা দখলের লড়াইকে হার মানাচ্ছে। ম্যাকার্থিতন্ত্রের একুশ শতকীয় সংস্করণ আজ সাইবার-বিশ্বের আন্তর্জালে ছড়িয়ে। উনিশ শতকে বেন্থাম-কল্পিত 'প্যান-অপটিকন'-র নজরদারির সুউচ্চ মিনার এখন মহাকাশে। গোয়েন্দা-উপগ্রহগুলির শ্যেন-দৃষ্টিতেই শুধু ভরসা নেই। 'প্রিজম' এবং অন্যান্য অতিকায় ডিজিটাল তথ্যসংগ্রহ এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থার মাধ্যমে সাইবার-বিশ্বে অহোরাত্রি গোয়েন্দাগিরিতে ব্যস্ত পেন্টাগন-সিআইএ-এনএসএ। মিত্র রাষ্ট্রনায়কবৃন্দ থেকে শত্রুদেশ, সংগঠন ও ব্যক্তি, এমনকি আমেরিকা ও অন্যত্র আম-পাবলিকের ফোন মোবাইল-কম্পিউটারে আড়িপাতা এবং 'ই-মেল নজরদারির' এই বিশ্বব্যাপী ব্যবস্থা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার তথা রাষ্ট্রীয়-সামাজিক-পারিবারিক পরিসরের পুরোন বিভাজনকে হাস্যকর করে তুলেছে। সিরিয়া থেকে লাইবেরিয়া, উত্তর কোরিয়া থেকে

ভেনেজুয়েলা, যারা গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রপ্তানিতে মরিয়া, তাদের খাসতালুকে বা অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে (যেমন পাকিস্তান) যে কোনও ব্যক্তি যে কোন মুহূর্তে মার্কিন রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার পক্ষে বিপদজ্জনক চিহ্নিত হয়ে হয় নিকেশ, নয় জেলে। শাসকীয় দমন-পীড়ন, নিয়ন্ত্রণ-নজরদারি, আতঙ্ক-ভীতিসঞ্চারের বর্বর ঔপনিবেশিক মডেলটির সঙ্গে উত্তর -৯/১১ যুগের পরিশীলিত, নিঃশব্দ, প্রযুক্তিনির্ভর এবং অধিকতর আগ্রাসী পুলিশ-রাষ্ট্রের মডেলটির ফিউশন বিশ্ব জুড়েই দ্রুত ঘটছে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্রটির সঙ্গে জোট বাঁধছে নেহরু-নাসের-টিটোর উত্তরসূরীরা। যে অ-রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস আমজনতার প্রাণঘাতী, বিভাজনকারী এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের পক্ষে জনমত তৈরিতে সাহায্য করে, তার বিরোধিতা করতেই হবে কিন্তু এ কোন্ অভূতপূর্ব রাষ্ট্রব্যবস্থার বেড়াজালে আমরা!

ভারতের শাসকেরা অরওয়েলের '৮৪' এবং তাঁর বর্ণিত 'থট-পুলিশ' মগজে কারফিউ জারির ব্যবস্থায় স্বদেশি 'স্ফটিক' নির্মাণে ব্যস্ত। ২০১২ সালে তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত অন্তর্বর্তী নির্দেশিকায় ইন্টারনেটে সেন্সরশিপ কায়েমে ৩৬ ঘণ্টার নোটিশে 'আপত্তিকর' ওয়েবসাইট এবং 'পোস্টিং' মুছে ফেলতে হুকুমজারি হয়েছে 'সার্ভিস প্রোভাইডার' এবং সার্চ-ইঞ্জিন' পরিচালকদের প্রতি। তথ্য-প্রযুক্তি আইনের ৬৬ক ধারা এবং এবছরের সাইবার নিরাপত্তা নীতির সূত্রে মার্কিনি কায়দায় যোগাযোগের সকল মাধ্যমে আড়িপাতা ও নজরদারির ঊর্ণনাভ জাল নাৎসি-ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্র বা স্তালিনতন্ত্রকে লজ্জা দেবে। রাষ্ট্রের তথাকথিত শত্রু বা শত্রুদের সহযোগীরূপে সন্দেহভাজন বন্দির ভিড়ে আরও উপচে উঠবে আমাদের জেলখানাগুলি। দেশময় মিনি-গুলাগ আর কনশেনট্রেশন ক্যাম্পের বিভীষিকা আর ঘোর দুঃস্বপ্নে সীমিত থাকবে না। দমন-পীড়নের শিকার মানুষগুলির অস্তিত্ব ঘিরে নীরবতা ও অস্বীকারের যুগলবন্দীতে আপাতত তারই মহড়া।

১৮৬০ সালের ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত রাজদ্রোহমূলক উস্কানি (সিডিশন) রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ও শত্রুরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগসাজশ ইত্যাদি অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিবিধান স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্মকালীন কবচকুণ্ডল। ভারতীয় রাষ্ট্রের স্বঘোষিত শত্রু সিপিআই (মাওবাদী) এবং মাওবাদীদের সমর্থক-দরদী রূপে অভিযুক্ত চিদাম্বরম-বর্ণিত 'ঝোলাওয়ালার'র দল তো প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ-ঘোষিত অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রধান বিপদই। কাশ্মীর থেকে মণিপুর, স্বাধীনতাকামী বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠী এবং পাকিস্তানি মদতপ্রাপ্ত ইসলামিক সন্ত্রাসীদের প্রকৃত ও সম্ভাব্য দোসর সংগঠনগুলির সদস্য সমর্থক-সহযোগীরাও রাষ্ট্রের পয়লা নম্বর শত্রু। এতেই শত্রু তালিকা শেষ হলে জাতি-রাষ্ট্রের আত্মরক্ষার যুক্তির একরকম মানে বোঝা যেত। কিন্তু টাডা-পোটা-র ধারাবাহিকতায় কেন্দ্রীয় আইন 'আন-ল'ফুল অ্যাক্টিভিটিজ প্রিভেনশন অ্যাক্ট' (ইউএপিএ) এবং নানা রাজ্য-আইনগুলির (যেমন জম্মু ও কাশ্মীরের পাবলিক সেফটি অ্যাক্ট, ছত্রিশগড়ের স্পেশাল পাবলিক সিকিউরিটি অ্যাক্ট) মাধ্যমে রাষ্ট্র ও জাতির শত্রুতালিকা দীর্ঘতর। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির দমনমূলক আইনের যুগলবন্দীতে আজ শুধু রাষ্ট্র বা শাসনতন্ত্রের মতাদর্শগত বিরোধী বা সশস্ত্র প্রতিস্পর্ধীরাই জেলখানায় নেই। ভারতীয় সংবিধান ও সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বহু নাগরিকও কারান্তরালে অথবা মধ্যরাতে কড়া নাড়ার অপেক্ষায়। তাঁদের অপরাধ, তাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামের লাখো শহিদের অনারব্ধ স্বপ্নের প্রণোদনায় সংবিধানের মহতী আদর্শগুলির প্রতি শাসকদের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার। বৃদ্ধপ্রায় গণতন্ত্রের অভিভাবকতন্ত্রের অনাচার-ব্যভিচারের বিরুদ্ধে পথে নামেন, প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থাটির অজস্র ফাঁকফোকর উন্মোচিত করেন, সার্বভৌম আমজনতা তথা নির্বাচকদের কাছে সরকারি পুলিশ প্রশাসন আইনসভা এবং বিচারবিভাগের দায়বদ্ধতার তত্ত্বকে বাস্তবায়িত করার কথা বলেন। সংসদ-বিধানসভা-নগরপালিকা-পঞ্চায়েতের সঙ্গে রাজপথ-জনপথ, গ্রাম-শহরের ক্রমবর্ধমান দূরত্ব ঘুচিয়ে শাসিতের গণতন্ত্র চান।

এদের অনেকেই আজ উন্নয়ন-বিকাশের নামে জাতীয় সম্পদ ও আয়ের কেন্দ্রীভবন, জনতার জল-জঙ্গল-জমিন-জীবিকা-আশ্রয় এবং পরিবেশ-প্রতিবেশ-গোষ্ঠীজীবনের উপর ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রীয় ও কর্পোরেট পুঁজির সমবেত আক্রমণের বিরোধী। শাসকদের উন্নয়ন-বিকাশের মডেল বা তার পরিভাষা-প্রতর্ককে এরা বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে নারাজ। অন্যদিকে মধ্যরাত্রের এইসব সন্তান বা তাঁদের উত্তরসূরীরা 'ইণ্ডিয়া' নামে 'আইডিয়া'টির চাপানো ব্যাখ্যাকে ধ্রুব সত্য জ্ঞান করেন না। শৃঙ্খলের ঐক্য ও সংহতি, কাঁটাতারের বেড়ায় ঘেরা জাতিরাষ্ট্রের মানচিত্রের মাপে জাতীয়তা নির্মাণের অনৈতিহাসিকতা, ধাপ্পাবাজি এবং ভাবের ঘরে চুরি মেনে স্বখাত-সলিলে আরও ডুবতে চান না। রক্তমাংসের ভারতের আত্মার আত্মীয়তায় ঋদ্ধ এক স্বদেশ-সমাজের স্বপ্ন নিয়ে ত্রিখণ্ডিত উপমহাদেশের দাঙ্গা-যুদ্ধ-ঘৃণা-অবিশ্বাসের অলাতচক্র থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাজাত এই ভারত-ভাবনা তথা উপমহাদেশ-চেতনা। রাষ্ট্র-স্বদেশ-সমাজ দর্শনে শাসকীয় মৌরসিপাট্টা অস্বীকার করে এঁরা চান বহুস্বরের স্বাধীনতা। কিন্তু রাষ্ট্রের অভিভাবকেরা নিরাপত্তার দোহাই পেড়ে সে স্বাধীনতাকে নির্মমভাবে দমন করছে। মহাভারতভূমির প্রতি প্রান্তে জনাকাঙ্ক্ষা, গণপ্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সহমর্মী প্রতিটি কণ্ঠ হয় জেলখানায়, নয় সেদিকে পা বাড়িয়ে। মাওবাদী সশস্ত্র জনযুদ্ধে বিশ্বাসী বা গান্ধীবাদী অহিংসায় নিবেদিতপ্রাণ, সমাজতন্ত্র বা গণতন্ত্রের নানা রকম-ফের ঘিরে বিকল্প ভারতের স্বপ্ন সন্ধান— প্রতিবাদীর মতাদর্শগত অবস্থানে রাষ্ট্রীয় মনোভাবের

ইতর-বিশেষ ঘটছে না। যদি তিনি বা তাঁরা উন্নয়নী হিংসা-লুণ্ঠনের বিরোধিতা করেন, জাতীয় নিরাপত্তার নামে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সমালোচনা করেন, পথে নামেন, তবে রাষ্ট্রশত্রুর তালিকায় নাম উঠে যাবে।

রাষ্ট্রদ্রোহী, রাজদ্রোহীর তালিকায় কে নেই? মাওবাদী নেতৃবৃন্দ তো বটেই। মানবাধিকার কর্মী তথা পিইউসিএল নেতা বিনায়ক সেন, সীমা ও বিশ্বজিৎ আজাদ, কমিটি ফর রিলিজ অফ পলিটিক্যাল প্রিজনারস কর্মী প্রশান্ত রাহী, হেম মিশ্র, প্রফুল্ল ঝা সহ ছোট পত্রপত্রিকার বেশ কিছু সাংবাদিক মাওবাদী সংযোগের অভিযোগে হয় এখনও হয় বন্দি, নয় জামিনে মুক্ত। গুজরাট-মহারাষ্ট্রের দলিত-সাংস্কৃতিক কর্মীবৃন্দ, তামিলনাড়ুর কুড়ানকুল্লামে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র-বিরোধী আন্দোলনের নেতা এস পি উদয়কুমার, তার সহযোগী পুষ্পরায়ণ, ডঃ সুনীলম ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ৫০ জনের বেশি কর্মীবৃন্দ, কেরালা-ছত্রিশগড়-ঝাড়খণ্ড-মধ্যপ্রদেশ-উড়িষ্যা-রাজস্থানে নদীবাঁধ, খনি, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও অন্যান্য মেগা-উন্নয়ন প্রকল্পে বিস্থাপন-বিরোধী আদিবাসী-মূলবাসী আন্দোলনের নানা নেতৃবৃন্দের অনেকেই রাজদ্রোহে উস্কানি বা সিডিশনের দায়ে অভিযুক্ত। এঁদের অনেকেই মাওবাদী প্রতিহিংসার সমালোচক এবং আইনি পথে প্রতিবাদ-প্রতিরোধে বিশ্বাসী।

কাশ্মীরে ২০১০ সালে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রতিবাদে বিক্ষোভপর্বে সিআরপি-পুলিশের গুলিতে একশোর বেশি কিশোর-যুবক প্রাণ হারান। সেই সময় থেকে ২১৯ যুবক রাজ্য জননিরাপত্তা আইনে বন্দি। এবারের ঈদে রাজ্যবাসীর প্রতি শুভেচ্ছাজ্ঞাপক বার্তা হিসেবে তাঁদের মুক্তির আবেদন জানান রাজ্যের মূল ধারার রাজনীতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। এর মধ্যে সিপিএম, পিডিপি ইত্যাদি দলের নেতারা ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিন নাবালক ভিন্ন আর কেউ মুক্তি পেলেন কিনা তা এখনো জানা যায় নি। কিন্তু কাশ্মীরের মানবাধিকার বিষয়ক সংগঠন আইপিটিকে এবং এপিডিপি এবং আন্তর্জাতিক সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশন্যাল ও হিউম্যান রাইটস ওয়াচ তাদের এ বছরের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, ব্রিটেনে সিডিশন আইন লুপ্ত হলেও ওই আর্কেয়িক বা মান্ধাতার আমলের আইন ভারত সরকার বহাল রেখেছে। সুপ্রিমকোর্ট ওই আইন প্রয়োগে যে গাইডলাইন দিক না কেন, সরকার তা মানছে না। সিডিশন ও অন্যান্য আইনে যথেচ্ছ ধরপাকড় চালাচ্ছে। অন্যদিকে সশস্ত্র ফৌজ বিশেষাধিকার আইন (আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার এ্যাক্ট) এবং উপদ্রুত এলাকা আইনের (ডিসটার্বড এরিয়াস এ্যাক্ট) মাধ্যমে সরকারি ফৌজের বে-লাগাম দমন-পীড়নে বৈধতা যুগিয়ে যাচ্ছে। কাশ্মীর ও উত্তর-পূর্বে এই সব আইন প্রত্যাহারের দাবি ও তীব্র জনমত গড়ে উঠলেও দিল্লীর ফৌজি এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাকেন্দ্র তাতে কর্ণপাত করেনি। যেমন বিশেষাধিকার আইনের দৌলতেই ২০০০ সালে পাথরিবাল এবং ২০১০ সালে মাছিলে নিরীহ গ্রামবাসীদের হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত ফৌজিদের অসামরিক আদালতে বিচারের দায় থেকে মুক্তি মিলেছে সুপ্রিমকোর্ট এবং হাইকোর্টে। ইতিমধ্যে কেন্দ্র ও রাজ্য ২১৪টি গুম-খুন, অত্যাচার ও হত্যার ঘটনায় সন্দেহভাজন ৪৭ জন উর্দিধারী সরকারি জওয়ান এবং ৩০ জন সরকার-সমর্থক জঙ্গির বিরুদ্ধে তদন্ত ও মামলায় উদ্যোগী হতে অস্বীকার করেছে। খারিজ হয়েছে ২৭০০টি 'অচিহ্নিত' কবর খনন এবং দেহ-উদ্ধার ও সনাক্তকরণের আবেদনও। স্থানীয় মানুষ ও মানবাধিকার সংগঠনগুলি অভিযোগ, নয়ের দশক থেকে আজাদির দাবিতে প্রায়শই উত্তাল কাশ্মীর উপত্যকায় রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নে হারিয়ে যাওয়া মানুষগুলির দেহ মিলবে ওই সব কবরে। সত্যাসত্য নির্ধারণের বদলে গোটাটাকেই পাকিস্তানের দালালদের অপপ্রচার বলে উড়িয়ে দিয়ে আরও একবার মরুঝড়ে আচ্ছন্ন উটপাখির মতো আচরণে ব্যস্ত ভারতবিধাতাকূল।

কাশ্মীরে নিহত-আহত এবং বন্দিরা যদি ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের সঙ্গে বেইমানির সাজাপ্রাপ্ত তাহলে মধ্য ও পূর্বভারতে হতাহত এবং জেলবন্দি আদিবাসী-মূলবাসীরা বিপথগামী হওয়ার দায়ে শাস্তি পাচ্ছেন। ছত্তিশগড়ের আদিবাসী শিক্ষিকা সোনি সোরি ও তার তরুণ ভাইপো লিঙ্গারাম কোডাপি, যার স্বপ্ন ছিল সাংবাদিকতাকে ঘিরে— তাঁরা আজও অবর্ণনীয় অত্যাচারে পঙ্গুপ্রায় অবস্থায় জেলবন্দি, মাওবাদী সংশ্রবের অভিযোগে। ঝাড়খন্ডে সরকারি মদতে কর্পোরেট জমিদারদের বিরোধিতায় গ্রেফতার আদিবাসী অ্যাকটিভিস্ট দয়ামণি বারলা সম্প্রতি মুক্ত পেলেও ওড়িশার কাটরাম জোগার মতো বন্দিদের জামিন মেলেনি। আড়াই বছর বিচারাধীন বন্দী থাকার পর কেওনঝাড় ইন্টিগেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাণ্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নামে একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তিন কর্মী রবীন্দ্রকুমার মাঝি, মধুসূদন ভদ্র এবং কাণ্ডেরাম হেমব্রম রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার বিষয়ক সোস্যাল র‍্যাপোর্টার-এর হস্তক্ষেপে ছাড়া পেয়েছেন। হাজতে নির্মম অত্যাচার থেকে বাঁচতে মাওবাদী সংস্রবের অভিযোগ স্বীকার করেছিলেন তাঁরা, এই যুক্তিতেই সরকার এঁদের বন্দি রাখাকে সমর্থন করে। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় প্রতিহিংসার এক ভয়াবহ বেড়াজাল— হাজতে ভয়াবহ অত্যাচার, যা সোনি সোরির মত ভারত কন্যাদের ক্ষেত্রে যৌন নিপীড়ন মায় গোপনাঙ্গে পাথর গুঁজে দেওয়া পর্যন্ত। (দিল্লীর গণধর্ষিতা দামিনী বা নির্ভয়ার গোপনাঙ্গে লোহার রড ঢুকিয়ে হত্যার মামলায় অভিযুক্তরা মৃত্যুদণ্ড পেলেও রাষ্ট্রীয় উর্দিধারী ধর্ষক-নিপীড়কদের শাস্তি দেবে কে?) অত্যাচার থেকে রেহাই পেতে মাওবাদী বা আইএসআই সংস্রবের স্বীকারোক্তি এবং তারই ভিত্তিতে প্রলম্বিত বন্দিদশার ন্যায্যতা প্রমাণে তৎপর সরকার।

প্রজাতন্ত্রের বিবেকপ্রতিম কিছু মানুষের উদ্যোগে প্রচারের আলোয় আসা এহেন কিছু কারাবন্দির কথা দুনিয়া জানতে পারলেও আদিবাসী, দলিত, ধর্মীয়-ভাষিক সংখ্যালঘু এবং সম্প্রদায় নির্বিশেষে গরিব অধিকাংশ কারাবাসীর লাঞ্ছনা-যন্ত্রণার কাহিনী রয়ে যায় প্রাচীরের অন্তরালে। (কারাচিত্র, *অনীক*, আগস্ট, ২০১৩ দ্রষ্টব্য)। এদের অনেকেই রাজনৈতিক বন্দি। মাওবাদী এবং অপরাপর উন্নয়ন-বিরোধীদের প্ররোচনায় সরকার ও তস্য-মিত্র কর্পোরেট কোম্পানিদের রাহুগ্রাস থেকে জল-জমি-জঙ্গল বাঁচানোর লড়াইতে যোগ দিয়ে বা নির্বিচার ধরপাকড়ের জেরে বন্দি এরা পুলিশি এফআইআর-এ প্রধান অভিযুক্তদের সঙ্গে 'আদার্স'-এর তালিকাভুক্ত। দণ্ডকারণ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহল— আদিবাসী-মূলবাসী জনগোষ্ঠীগুলির এইসব অপাংক্তেয়, নাগরিক ভারতে অপরিচিতির অন্ধকারে ডুবে থাকা প্রান্তিক মানুষেরাই আজ অভিধাহীন রাজনৈতিক

আদিবাসী বন্দি : ছত্তিশগড়

মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে আদিবাসী বন্দিদের কীভাবে বছরের পর বছর জেলে ফেলে রাখার পর আদালতে তারা নির্দোষ প্রমাণিত হচ্ছেন তার কিছু তথ্য মিলেছে তথ্য জানার আইনে আবেদনক্রমে। আবেদনকারী আইনজীবী শিশির দীক্ষিত ২০০৬-১২ পর্বে দান্তেওয়াড়া জেলা আদালতে পঞ্জিকৃত ফৌজদারি মামলাগুলিতে সাজাপ্রাপ্ত (কনভিকশন) এবং বেকসুর খালাস (অ্যাকুইটাল) অভিযুক্তদের বিষয়ে জানতে চান। মাওবাদী সক্রিয়তার কেন্দ্র এই জেলার অধিকাংশ আদিবাসী অভিযুক্ত বিদ্রোহীদের সমর্থক হিসেবে বন্দি। দীক্ষিতের প্রাপ্ত তথ্যাদি উদ্ধৃত ও বিশ্লেষণ করে 'হিন্দু' পত্রিকার রায়পুর সংবাদদাতা শুভজিৎ বাগচী জানাচ্ছেন :

দায়রা আদালতে সোপর্দ (সেসনস ট্রায়াল) মামলায় অভিযুক্তদের ৯৫.৭ শতাংশ খালাস পেয়েছেন। অস্ত্র আইনে ৪২৫টি মামলার মধ্যে মাত্র তিনটিতে সাজা পেয়েছেন অভিযুক্ত বন্দিরা। বিস্ফোরক আইনে ১৫৭ টি মামলায় একটিতেও পুলিশ অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেনি। কিন্তু তার আগে বিচারাধীন আদিবাসীদের পাঁচ থেকে সাতবছর কারাবাস ঘটে গেছে। তথ্যে আরও স্পষ্ট, বিচার ব্যবস্থা ক্রমশ শ্লথগতি হয়ে বিচারাধীনদের নরকযন্ত্রণা বাড়িয়েছে। ২০০৫ সালে ২৮২টি মামলার নিষ্পত্তি হলেও পরের বছর তা নেমে দাঁড়ায় ১৫৮। ২০০৮ সালে আরও কমে ১৪৮। ২০১১ সালে আবার তা কিছুটা বেড়ে হয় ২২৯। ২০০৫ সালে রুজু মামলাগুলির মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘায়িত বিচারের তিনবছর চলেছে। ঐ বছর ১৯০টি মামলা রুজু হয় এবং অর্ধেক মামলা ওই বছরই শেষ হয়। কিন্তু ২০১২ রুজু মামলার মাত্র ১০ শতাংশ ঐবছরে নিষ্পত্তি হয়। অর্থাৎ সরকার মামলা টানতে ব্যগ্র, যাতে বন্দিদের যত দীর্ঘকাল সম্ভব আটকে রাখা যায়। পুলিশি তদন্তে ঢিলেমি বিস্ফোরক সংক্রান্ত ফরেনসিক রিপোর্ট ইত্যাদি পেশে দেরির কারণে শুনানির তারিখনামা বাড়তে থাকে।

অপর এক আরটিআই সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যাচ্ছে, দক্ষিণ ছত্তিশগড়ে ১০৬৭ জন বিচারাধীন বন্দির ৯৫ শতাংশই আদিবাসী। এদের অধিকাংশই গোন্ড ভাষায় কথা বলেন। গোটা রাজ্যের ৬০ শতাংশ বিচারাধীন বন্দিই জনজাতীয়।

২০১২-র মে মাসে মাওবাদীদের দ্বারা অপহৃত সুকমার কালেক্টরের মুক্তির শর্ত হিসাবে আদিবাসী বন্দিদের মামলার পর্যালোচনা ও দ্রুত মুক্তির বিষয়ে গঠিত নির্মলা বুচ কমিটি সাম্প্রতিক অন্তবর্তী রিপোর্টে জানিয়েছে: ৯৯০ জন আদিবাসী বন্দি দুই বা ততোধিক বছর বিচারাধীন অবস্থায় জেলে। এক বছরের বেশি সময়ে কমিটি মাত্র ২৩৫টি মামলার পর্যালোচনা করেছে। এর মধ্যে ১১০টি বিচারাধীনের ক্ষেত্রে, যাদের মধ্যে ৬৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ নকশালপন্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ। কমিটি সরকারকে তাঁদের জামিন আবেদনের বিরোধিতা না করার সুপারিশ জানিয়েছে। এমনকি বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী রামন সিংহ তথা সালওয়া জুড়ুম-এর অভিযানের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রাক-নির্বাচনী পর্বে কবুল করেছেন, বহু আদিবাসী জেলবন্দি এবং তাদের 'বের করে আনা দরকার'। কিন্তু সাফ নাকচ করেছেন 'সাধারণ ক্ষমা'র সম্ভাবনা, যা কিনা কিছু আমলার (সম্ভবত বুচ কমিটিরও) প্রস্তাবিত। বদলে 'কেস টু কেস' পর্যালোচনার পক্ষেই তার রায়। নভেম্বরে রাজ্য নির্বাচনের পর এই 'রিভিউ'-এর চক্করে পড়ে ছত্তিশগড়ের আদিবাসী বন্দিদের পরিণতি কী হবে, তা অনুমেয়।

সূত্র : *দ্য হিন্দু*, ২৯ অক্টোবর, ২০১৩ এবং *টাইমস অব ইন্ডিয়া*, মে ৮, ২০১৩

"...দান্তেওয়াড়া জেলা জেলে সর্বাধিক ১৫০ বন্দি রাখার ব্যবস্থা আছে। অথচ সেখানে আছে ৬৩০ জন বন্দি। অধিকাংশ আদিবাসী নারী ও পুরুষ, যারা আদালতে উকিল ধরার ক্ষমতা রাখেন না। এদের অধিকাংশকেই গ্রেফতার করা হয়েছে মাওবাদীদের সন্ধানে আধা-সামরিক বাহিনীর তল্লাসি অভিযান পর্বে। নিজেদের গ্রাম-গোষ্ঠী-পরিবার থেকে বহুদূরে জেলা ও কেন্দ্রীয় জেলগুলিতে বন্দি এই সাধারণ আদিবাসী গাঁ-গঞ্জের মানুষ। তাঁদের দীর্ঘদিন আদালতে পেশ করা হয় না। লিগ্যাল এইড-এর আইনজীবীদের উপর নির্ভরশীল এই বন্দিদের মামলার শুনানি হয় না মাসের পর মাস। নানা কারণে ওইসব সরকারি আইনজীবীরা তাঁদের মামলা নিয়ে তদবির-তদারক করেন না। হতদরিদ্র মানুষগুলির জামিনদার জোটে না। ছত্তিশগড় এবং ওড়িশার 'কালেক্টর'দের অপহরণের ঘটনার পর্বে মাওবাদীরা এহেন হাজার হাজার বন্দী আদিবাসীর দ্রুত এবং বিচারের দাবি তোলেন। কিন্তু নির্মলা বুচের নেতৃত্ব উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কমিটির কোনও সুপারিশ দুই রাজ্য সরকারই কার্যকর করেনি।"

সূত্র : অন্ধ্রের হিউম্যান রাইটস ফোরাম'-এর রিপোর্ট :
দ্য টেরিবল কস্ট অফ অ্যান ইনহিউম্যান কাউন্টার ইনসারজেন্সি, অক্টোবর ২০১৩

পুনশ্চ : ছত্তিশগড় রাজ্য সরকারের ওয়েবসাইট, 'বিশ্বস্থানীয় ছত্তিশগড়', তন্নতন্ন করে খুঁজেও রাজ্যের জেলবন্দি 'মাওবাদী' তথা ছত্তিশগড় স্পেশাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট ইত্যাদি আইনে বন্দিদের বিষয়ে তথা আদিবাসী বন্দি প্রসঙ্গে নির্মলা বুচ কমিটির সুপারিশ সংক্রান্ত কোনও তথ্য মেলেনি। আর ওড়িশা সরকারে ওয়েবসাইটে তো রাজ্যের জেল সংক্রান্ত 'ওয়েবপেজ' খুলছেই না।

বন্দিদের মধ্যে সংখ্যাগুরু। রাষ্ট্র বা শাসক-সরকারের প্রতি মতাদর্শগত সমর্থন বা বিরোধিতার মধ্যবিত্ত প্রতর্কগুলির থেকে অনেক দূরে অস্তিত্বের সংগ্রামে ব্যস্ত মানুষগুলির রাষ্ট্রচেতনা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা স্থানীয়, গোষ্ঠীগত ইতিহাস এবং প্রজন্মান্তরে বাহিত উপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ-উৎসাদনের জনস্মৃতি ও গণঅভিজ্ঞতা জারিত। মধ্যরাত্রের জাতক খণ্ডিত জাতি-রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদ্রোহ, বা জাতীয়স্বার্থ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন কানুনের প্যাঁচ-পয়জার তারা জানেন না। কাফকার জোসেফ কে-র মতো তাঁরা জানেন না কোন্ অপরাধে তাঁরা বন্দি। সুবিচারের আশায় ক্ষমতার দুর্গে কড়া নাড়ার বিভ্রমটুকুও তাঁদের পক্ষে বিলাসিতা।

সাইবার যুগের গণতন্ত্রের মজা এমনই যে নিজের বা গোষ্ঠীর বাস্তুভিটে, বাপ-পরদাদার চাষের জমি, জঙ্গল-নদী-ঝোরা বাঁচাতে গিয়ে অজান্তে রাষ্ট্রের পা মাড়িয়ে ফেলা মানুষগুলির ক্ষেত্রেও আইনি অজ্ঞতা ক্ষমার অযোগ্য। এই 'অনুন্নত অন্ধকারময় অপর'-এর জীবন-জীবিকার মূল্যে আলোকিত উন্নয়ন-বিভোর ভারতের স্বার্থপর স্বপ্নযাত্রা সম্পর্কে মাঝে মধ্যে ক্ষমতার অলিন্দে বা সংবিধান ও আইনের ব্যাখ্যাকার শীর্ষ আদালতে চেতাবনি শোনা যায়।

যেমন ছত্তিশগড়ে কংগ্রেস-বিজেপি, কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ উদ্যোগে সালওয়া জুডুমের নামে আদিবাসী বিভাজন এবং ভাড়াটে খুনি বাহিনী গড়ে নৃশংস হত্যা-ধর্ষণ-গ্রাম জ্বালানোর অভিযান এবং ওড়িশার নিয়মগিরিতে পাহাড়-বন ধ্বংস করে বেদান্তগোষ্ঠীর বক্সাইট-খনি প্রকল্পে বাদ সেধেছে সুপ্রিমকোর্ট। প্রথম ক্ষেত্রে সরকারি-কর্পোরেট যৌথ উন্নয়ন মডেল তীব্র ভাষায় নিন্দিত, বিশেষ করে আদিবাসীদের স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎকে নির্মূল করে খনিজ আহরণ ও ব্যবহারের প্রয়োজনে বে-লাগাম উন্নয়নী হিংসার প্রতি ধিক্কার উচ্চারিত শীর্ষ আদালতের রায়ে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত গ্রামসভার মিলিত নির্ণয় শিরোধার্য করার নির্দেশ। যার জেরে আপাতত বেদান্ত-প্রকল্প হিমঘরে। কিন্তু এ

রাজদ্রোহে উস্কানি, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা, ষড়যন্ত্র এবং সন্ত্রাসবিরোধী ইউএপিএ সহ নানা দমনমূলক আইনে রাজনৈতিক বন্দিদের এবং জামিনে মুক্তদের অসম্পূর্ণ তালিকা:

কাশ্মীর : ২১৯ জন যুবক নিরাপত্তা বাহিনীকে লক্ষ্য পাথর ছোঁড়া ইত্যাদি অভিযোগে অভিযুক্ত। এছাড়া বহুজন বিভিন্ন আইনে বন্দি। সংখ্যাটি কয়েক হাজার হতে পারে।

ছত্তিশগড় : সোনি সোরি, লিঙ্গারাম কোডোপি, বিনায়ক সেন, প্রফুল্ল ঝা, টি অজয়, মালতী রেড্ডি, মীনা চৌধুরী এবং ৯৯০ জন বিচারাধীন আদিবাসী।

উত্তরাখন্ড : ৯ জন, এর মধ্যে ৮ জন দলিত শ্রমিক, প্রশান্ত বাহী, হেম মিশ্র প্রমুখ। তেহরি বাঁধ ও অন্যান্য বাঁধ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সহ অন্তত ৫০ জন।

হরিয়ানা : বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিলের বিরোধী ছাত্র, অনুন্নয়নের অভিযোগে নির্বাচন বয়কটকারী ১৯ জন গ্রামবাসী সহ অনেকে। ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়নের পরপর পাঁচ বারের সভাপতি, পুনম নামে এক মহিলা।

উত্তরপ্রদেশ : সীমা ও বিশ্বজিৎ আজাদ, বাটলা হাউস মামলায় অভিযুক্ত ২৭ জন আজমগড় নিবাসী।

বিহার : অন্তত চারশোজন মাওবাদী ও অন্যান্য নকশালপন্থী বন্দি। ৫ জন কৃষক আন্দোলনের কর্মী মৃত্যুদন্ডে দণ্ডিত।

ঝাড়খন্ড : অন্তত এক হাজার মাওবাদী এবং অন্যান্য উন্নয়ন-বিরোধী আন্দোলনের 'নেতা-কর্মী-সমর্থক'।

মহারাষ্ট্র : অরুণ ফেরেইরা এবং অন্যান্য শখানেক 'মাওবাদী' কর্মী এবং সিমি-সমর্থক ইউএপিএ এবং মহারাষ্ট্র কন্ট্রোল অব অর্গানাইজড ক্রাইম আইনে বন্দি।

তামিলনাড়ু : কুড়ানকুলাম পারমাণবিক বিদ্যুৎ-কেন্দ্র বিরোধী আন্দোলনের ৩০জন নেতৃস্থানীয় কর্মী এবং ২৫০০ জন সিমি সদস্য।

কেরালা : পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়ার ২১ সদস্য, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত বহু পুরুষ ও মহিলা।

অন্ধ্র : জিহাদি সন্ত্রাস তথা মক্কা মসজিদ বিস্ফোরণে অভিযুক্ত মুসলিম যুবকেরা, যাদের অনেকে পরে বেকসুর মুক্তি পান।

মণিপুর : পিএফআই এবং অন্যান্য সংগঠনের কিছু সদস্য। ৮০ বছরের বৃদ্ধ আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট-এ ধৃত।

ওড়িশা : অন্তত দুশো। অধিকাংশই পস্কো ও অপরাপর মেগা-প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণবিরোধী আন্দোলনের কর্মী-সমর্থক গ্রামবাসী, যাদের মধ্যে আদিবাসীরাই প্রধান। এদের মধ্যে শিশুরাও আছে। বেদান্ত কোম্পানির একটি প্রকল্পে বাধা দিয়ে ধৃত ৪৭ জন।

কর্ণাটক : ছটি জেলে বন্দি ২৭টি মামলার অভিযুক্ত। সকলেই মুসলমান।

পশ্চিমবঙ্গ : একশোর বেশি ইউএপিএ বন্দি এবং অন্যান্য আইনে আটক অন্তত সমসংখ্যক জঙ্গলমহলের আদিবাসী মূলবাসী। এছাড়াও এসইউসিআই ও গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সমর্থক।

রাজস্থান : জয়পুর বিস্ফোরণে অভিযুক্ত ৬ মুসলিম যুবক।

গুজরাত : অন্তত ২০ জন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, এনজিও ও সামাজিক আন্দোলন সংগঠক ইউএপিএ আইনে অভিযুক্ত। এর আগে টাডায় বন্দি ছিল সাড়ে সতের হাজার।

সূত্র : বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিবেদন এবং সে সংক্রান্ত মিডিয়া রিপোর্ট ইত্যাদি।

যে সমুদ্রে বালির বাঁধ তা 'মাওবাদী মুক্ত' সারান্ডা, ও অপরাপর বনাঞ্চলে খনি-বন্টন ইত্যাদি সরকারি নীতিতে স্পষ্ট। আদিবাসী-কল্যাণবিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের মন্ত্রী কিশোরভঞ্জ দেও বা গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী জয়রাম রমেশের শ্যাম ও কুল রক্ষার নানাবিধ হাহুতাশে মনমোহন-চিদাম্বরম-কমলনাথ-আনন্দ শর্মারা কর্ণপাত করতে রাজি নয়।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বার্ষিক রিপোর্টেও দম্ভ প্রকট। উগ্র বামপন্থা সম্পর্কিত প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে : ''সিপিআই(মাওবাদী)-র মতাদর্শ দৃষ্টিভঙ্গি যে বর্তমান ভারতীয় সমাজ ও দুনিয়ার আশা আকাঙ্ক্ষার বুনোটের সঙ্গে সম্পূর্ণ বেমানান সে বিশ্বাস স্থানীয় জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যেও ছড়াচ্ছে।'' সরকারি উন্নয়নী মডেলটির সমালোচক যে শুধু মাওবাদীরাই নয়, খোদ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এবং অপরাপর বহু অহিংসাও সংবিধান বিশ্বাসীরাও— সে সত্য চেপে গিয়েছে আম আদমির সরকার। ইরম চানু শর্মিলা ও হিমাংশু কুমারের মতো গান্ধীবাদীরাও ঘোষিত বা অঘোষিত রাষ্ট্রশত্রু, রাজদ্রোহীর তালিকা তাই দীর্ঘতর।

ভারতভাগ্যের পরিহাস এমনই যে 'অভিনব ভারতী' নামে কট্টর হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সংগঠনের জড়িত থাকার তথ্যপ্রমাণ সামনে এলেও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক তাকে নিষিদ্ধ তালিকাভুক্ত বা তার পাণ্ডাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস, রাজদ্রোহ বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মামলা আনতে রাজি নয়, পাছে সঙ্ঘ পরিবার চটে যায়। মাওবাদী ও ইসলামিক সন্ত্রাস দমনে জাতীয়তাবাদী ঐক্য বিঘ্নিত হয় না। গুজরাতের 'ফেক এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট'-রা তো রাষ্ট্রের সম্পদ! অন্যদিকে জিহাদি ইসলামের সন্ত্রাসী কার্যকলাপে যুক্ত থাকার সন্দেহমাত্র মুসলিম যুবকদের গ্রেফতার এবং দীর্ঘকাল কারাবাসের ব্যবস্থা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মুরুব্বিদের প্রশংসাধন্য। সুপ্রিম কোর্টে অভিযুক্ত কয়েকজন শেষপর্যন্ত বেকসুর খালাস পেলে বিড়ম্বনা এড়াতে ভোটের মুখে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিন্দে 'অকারণে' মুসলিম যুবকদের ধরপাকড়ে রাশ টানার নিদান দিয়েছেন। ভোট যে বড় বালাই।

মজা হচ্ছে, টু-জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারি মামলায় আটক মন্ত্রী কর্পোরেটে কর্তাদের জামিনের দাবিতে সওয়ালের পর্বে সুপ্রিম কোর্টের বিধান : 'বেইল ইজ দ্য রুল, জেল ইজ এক্সসেপশন'। দেশের সম্পদ লুণ্ঠনকারীদের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রয়োগে বৃহৎ পুঁজির নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া ও রাজনৈতিক দলগুলির কম্বুকণ্ঠ অথচ এই লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে সোচ্চার নাগরিক সমাজ ও আন্দোলন-সংগঠনের কর্মী সমর্থকদের ক্ষেত্রে উল্টোটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়ালেও বৃহৎ মিডিয়ার চাপে দেশ জুড়ে জেলে জেলে বন্দিদের 'অনশনধর্মঘটের খবর কদাচিৎ জায়গা পায়।

ভারতীয় গণতন্ত্রের উচ্চতম সৌধ সংসদ। লোকসভার সদস্যদের চল্লিশ শতাংশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপরাধে মামলা চলছে। ইতিমধ্যে দোষী সাব্যস্ত এবং জেলবন্দি সাংসদের পদচ্যুতি আটকাতে সর্বদলীয় অনুমোদনে আইন প্রনয়ণ শুধু সময়ের অপেক্ষায় ছিল। লালুপ্রসাদের জেলযাত্রা আটকাতে তড়িঘড়ি আনা অর্ডিন্যান্স আইনে বদল হত যদি না জনমতের চাপে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী তরুণ রাহুল গান্ধীর বিবেক-বিস্ফোরণটি না ঘটত। অথচ একের পর এক অর্থনৈতিক কেলেঙ্কারি তথা দুর্নীতির পাঁকে ডুবে থাকা প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির নেতা-নেত্রীদের সমালোচনায় বিভিন্ন ওয়েবসাইটে, ইন্টারনেটে এবং সোস্যাল মিডিয়ায় কার্টুন ছড়িয়ে বা ব্লগ লিখে, মন্তব্য করে রাজদ্রোহে একের পর এক অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট বা নিছক নেট-ভ্রমণকারীরা— অসীম ত্রিবেদী, অম্বিকেশ মহাপাত্র, রবি শ্রীনিবাসন, শহিন ধাধা, রেণু শ্রীনিবাসন এবং জয়া বিন্ধ্যালয়া তাঁদের মধ্যে কয়েকজন। অচিরেই এদের মতো আরও অনেকেরই হাজতবাস নিশ্চিত করতেই নানাবিধ সাইবার-নিরাপত্তা আইনের কঠোরতা বাড়ছে।

আগেই বলেছি, রাজদ্রোহী, জাতিদ্রোহী, গণশত্রুদের সরকারি তালিকা এভাবে দীর্ঘ হলেও প্রকাশ্য নথিপত্রে বিভীষণবাহিনীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকৃত নয়। কারণ ডিসেন্ট ও ডিসেন্টারদের উপস্থিতি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম গণতন্ত্রের শ্লাঘার পরিপন্থী। তাই তাদের সংখ্যা লুকিয়ে রাখা হয়েছে খুন-জখম, ডাকাতি-ধর্ষণ, চুরি-ছিনতাই-রাহাজানি মামলায় অভিযুক্ত, মাদকখোরদের পংক্তিতে। দিল্লীর ইউপিএ সরকারই হোক বা

৩১ ডিসেম্বর ২০১২, দিল্লিতে সিডিশন আইন বাতিলের দাবিতে দেশের ১৮টি মানবাধিকার সংগঠনের কনভেনশনে গৃহীত প্রস্তাবের অংশবিশেষ

এই কনভেনশন লক্ষ্য করছে, স্বাধীনতা সংগ্রাম দমনে ব্রিটিশ রাজের ব্যবহৃত এই আইন আজও আমাদের দণ্ডবিধির অন্তর্ভুক্ত। এর সবচেয়ে খারাপ প্রয়োগ হচ্ছে সমস্ত রকম বিরোধিতা ও প্রতিবাদের দমনে। কৃষক-শ্রমিক আন্দোলন, পরিবেশবাদী আন্দোলন, নারী-আদিবাসী-দলিত-সংখ্যালঘুদের নানা সংগঠন-আন্দোলনের কর্মী-সমর্থকদের বন্দি করা হচ্ছে দণ্ডবিধির ১২৪এ ও ইউএপিএ আইনের ২(ও) ধারায়। সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে রাজ্যস্তরের আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাগুলি। গণতন্ত্রের হৃদয়মূলে আঘাতকারী এই সমস্ত ধারাগুলি বাতিলের দাবি জানাচ্ছি আমরা। এছাড়া এইসব আইনে বন্দি বা অভিযুক্তদের মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহারের দাবিও করছি। কনভেনশন একই সঙ্গে সশস্ত্র বাহিনী (বিশেষ অধিকার আইন, ইউএপিএ, প্রিভেনশন অফ সিডিশিয়াস মিটিংস অ্যাক্ট ২০১১ ইত্যাদি) বাতিলের দাবিতে সমস্ত সচেতন নাগরিককে আন্দোলনে সামিল হওয়ার আবেদন জানাচ্ছে।

নরেন্দ্রমোদী-রামন সিংহ-শিবরাজ চৌহানের বিজেপি সরকার তথা অখিলেশ-জয়ললিতা-নবীন-মমতার সরকার— আড়ালে সবাই রাজবন্দির তালিকা রাখে। ভোটের সমীকরণ মেনে তাঁদের ছাড়ে এবং ধরে। এতে তাদের গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তি রক্ষা এবং সংসদীয় ও অসংসদীয় বিরোধীদের দুরমুশ করার দূরপনেয় মনোবাঞ্ছা পূরণ— দুইই ঘটে থাকে। বিশেষ করে ক্ষমতা-দখলের আগে বন্ধু থেকে ক্ষমতাসীন পর্বে সমালোচিত ও শত্রুতে পরিণত ব্যক্তি, আন্দোলন এবং সংগঠনের প্রতি সকল রাষ্ট্রের শাসকের মনোভাব এক। ধ্বংস করো, রক্তাক্ত করো, বন্দি করো তাদের যারা নার্সিসাসদের আয়না দেখানোর দুঃসাহস রাখে, বিরোধী ও শাসকধর্মের পার্থক্য বোঝে না এবং ক্যালিগুলাদের বিবেকপীড়নে অতীত-স্মরণে যত্নবান। ক্ষমতার ছিটেফোঁটা ক্ষীর-ননী পেয়ে বা না পেয়ে যারা ক্ষুব্ধ-ক্রুদ্ধ বা অভিমানী, তাদের তবু লাঠির সঙ্গে গাজরও মিলতে পারে। কিন্তু যারা জমানা-বদলের সঙ্গে জার্সি বদ্‌লে প্রণিপাতে অক্ষম, স্বাভিমান-শ্লাঘা বা স্বাধীনতা-বিভ্রমে ভোগে, রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার সনদ, ভারতীয় সংবিধান, সুপ্রিম কোর্টের অজস্র নির্দেশনামা তাদের জন্য কারামুক্তির মরীচিকার ঝলকমাত্র। পশ্চিমবঙ্গে এহেন অভিজ্ঞতার কথায় আসব পরবর্তী সংখ্যায়।

সিডিশন আইন সম্পর্কে ভুক্তভোগী এবং অপরাপর বিশেষজ্ঞদের অভিমতের সংক্ষিপ্তসার

ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১২৪ক ধারায় সিডিশন বা রাজদ্রোহের সংজ্ঞা লিখিত বা মৌখিক শব্দ বা সংকেতে অথবা দর্শনযোগ্য মাধ্যম বা অন্য উপায়ে যে ব্যক্তি আইন দ্বারা স্থাপিত (ভারত) সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা (hatred) বা অশ্রদ্ধা ছড়াবে বা তার চেষ্টা করবে, অসন্তুষ্টি (disaffection) তৈরি করবে বা তার চেষ্টা করবে তাকে জরিমানা সব যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত সাজা দেওয়া হবে। ব্যাখ্যা : 'অসন্তুষ্টি' বলতে সরকারের প্রতি আনুগত্যহীনতা (disloyalty) এবং সব ধরনের বৈরি মনোভাব (all feelings of enmity) বোঝাবে। সরকারের প্রতি ঘৃণা, অশ্রদ্ধা, অসন্তুষ্টি না ছড়িয়ে তার কোনও প্রশাসনিক এবং অন্যবিধ কার্যকলাপে আপত্তি জানিয়ে আইনি বৈধ উপায়ে তা পরিবর্তনের চেষ্টা এই ধারা বলে অপরাধ গণ্য হবে না।

বিনায়ক সেন : ১৯২২ সালে মহাত্মা গান্ধীকেও ঔপনিবেশিক বৃটিশ সরকার রাজদ্রোহে অভিযুক্ত করে। আদালতে গান্ধী বলেছিলেন, বৃটিশ সরকারের প্রতি তার কোনও প্রীতি (affection) নেই এবং কেন নেই তা দেশবাসীকে জানানো তাঁর কর্তব্য। তাঁকে দণ্ডিত করলেও বৃটিশ জজ এর জন্য ক্ষমা চেয়ে নেন। সিডিশন আন্দোলনের ইতিহাসে এ কাহিনী আজ লোককথার সামিল। এ থেকে ধারণা তৈরি হয় যে বিভ্রান্ত এক রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী খ্যাতনামা এবং তুলনামূলকভাবে ক্ষমতাসম্পন্ন লোকেরাই রাজদ্রোহে অভিযুক্ত হন। কিন্তু জেলের অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি বিপুলসংখ্যক সাধারণ নারী-পুরুষ এই আইনের ধারায় অভিযুক্ত এবং বন্দি। যেমন ধরা যাক কুড়ানকুলামে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বিরোধী শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের কর্মী-সমর্থকদের কথা। রাষ্ট্র আজ 'eminent domain' বা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ও সর্বত্রগামী অধিকার তত্ত্বের আড়ালে দেশব্যাপী জল-জঙ্গল-জমিন-খনিজ সহ জাতির তথা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সামূহিক সম্পত্তি ও সম্পদ লুণ্ঠনের গ্যারান্টিদাতার ভূমিকায়। জীবন-জীবিকা রক্ষার তাড়নায় এর বিরুদ্ধে ন্যায্য প্রতিবাদ-প্রতিরোধকে স্তব্ধ করতে রাজদ্রোহ আইন প্রয়োগ করা হচ্ছে। গণতন্ত্রের মৌলিক ধ্যানধারণার সঙ্গে রাজদ্রোহের ধারণা সম্পূর্ণ বেমানান। বর্তমান শাসক বা ক্ষমতাধরদের চিন্তানীতির বিরুদ্ধতায় বিকল্প রাজনৈতিক ভাবনার জন্ম বা তার প্রচার। এই অধিকারকে রাজদ্রোহের নামে পদদলিত করার ব্যবস্থা বর্তমান ক্ষমতাধরদের টিকে থাকার অঙ্গ।

প্রশান্ত রাহী : একজন ভুক্তভোগী হিসাবে বলতে পারি ইতিহাসে রাষ্ট্র-সরকারের বিরোধিতাই স্বাভাবিক। রাজদ্রোহ আইন তাকে অস্বাভাবিক করে তোলে। গণতন্ত্রের ধারণা এসেছে ফরাসি বিপ্লব থেকে। ১৭৮৯, ১৭৯১, ১৭৯৫ এবং বিশেষ করে ১৭৯২-র বিপ্লবকালীন ফ্রান্সের সংবিধানে এই ধারণা বিকশিত। '৯২তে বলা হয়, সরকারের বিরোধিতা করার অধিকার নাগরিকদের মৌলিক অধিকার। একবিংশ শতাব্দীর ভারতে রাজদ্রোহ আইন গণতন্ত্রের ইতিহাসের প্রতি মূর্তিমান বিদ্রুপ।

বিচারপতি রাজিন্দর সাচার (প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, দিল্লি ও সিকিম হাইকোর্ট, বিখ্যাত সাচার কমিটি রিপোর্টের প্রণেতা) : রাজদ্রোহ সংক্রান্ত আইন স্বাধীন ভারতেও বলবৎ রাখার পক্ষে-বিপক্ষে সংবিধান পরিষদে তীব্র বিতর্ক হয়। কে এম মুন্সী এবং কৃষ্ণ শাহীর মতো অনেকে এর বিরোধিতা করেন। স্বয়ং নেহেরু এই আইনটিকে অপছন্দ করতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, ঐতিহাসিক ও বাস্তবতাজনিত কারণে এটি রাখা হলেও যত দ্রুত সম্ভব এই প্রবল আপত্তিজনক এবং জঘন্য আইনটি থেকে রেহাই পাওয়া দরকার। এ সত্ত্বেও আইনটি থেকে গেছে, কেননা সরকার বিরোধিতা সামলাতে এই অস্ত্রটি হাতে রাখা জরুরি ভেবেছে। ইংলন্ডে ইতিমধ্যে রাজদ্রোহ আইন বাতিল হয়েছে যে সব যুক্তিতে তা হলো রাজদ্রোহের সংজ্ঞা অনির্দিষ্ট বা ধোঁয়াটে; যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এই আইনের উদ্ভব আজ তা অনুপস্থিত; আইনটি মান্ধাতার আমলের; বিরোধী মত, এমনকি তা যদি জনপ্রিয় নাও হয় সেটাকেও অপরাধীকরণ গণতন্ত্রসম্মত নয়; মতপ্রকাশের অধিকারের পক্ষে এর প্রভাব হিমশীতল। এর পরেও ভারতে ওই আইন লাগু আছে। আসলে এটা জনগণের প্রতি সরকারের যুদ্ধঘোষণার সামিল। কালাকানুনের ইতিহাস এদেশে বর্ণময়। একের পর এক দমনমূলক আইন আসছে, বদলাচ্ছে বা তুলে নেওয়া হচ্ছে। টাডা আইন তুলে নেওয়া হল কেননা মাত্র ০-১ শতাংশ মামলায় 'কনভিকশন' বা দণ্ড দেওয়া যাচ্ছে। টাডার বদলে পোটাও তাই। এখন পোটা আর ১৯৬৭ সালের ইউএপিএ আইন মিলিয়ে নতুন ইউএপিএ এসেছে যা আরও মারাত্মক।